ব্যাবিলন কথকতা

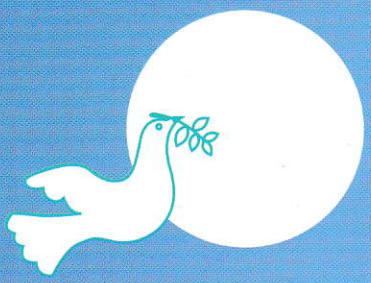

দ্বিতীয় সংখ্যা
১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭

ব্যাবিলন গ্রুপ

সম্পাদক:

এমদাদুল ইসলাম

আহ্বায়ক:

মুহাম্মদ সাইফুল হক

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন:

স্বাধীন খান

মোস্তফা কামাল

সহযোগিতায়:

ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণে:

অক্ষর প্রিন্টার্স

১৪, কাটাবন, ঢাকা।

৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

সূচীপত্র

পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা বাণী		২
সম্পাদকীয়		৩-৪
শুভেচ্ছা	সোনিয়া ইসলাম	৫
সাগর পাড়ের জীবন	মোঃ শহীদুল ইসলাম	৬
একুশ	সেখ মোঃ অয়েজ হোসেন (পলাশ)	৬
ব্যাবিলন কথকতা	মোঃ নুরুল ইসলাম	৬
গভীর ব্যথা	মীর আরিফ রানা (স্বপন)	৭
মুক্তিযুদ্ধ	মোঃ ফেরদৌস	৭
কে আমি?	কামরুল আহসান অপু	৭
মা তোমাকে ভালবাসি	মোঃ শাহীন রেজা	৮
আমার দেশ	খাদিমুল ইসলাম	৮
সে এসেছিল	কোয়েল তালুকদার	৮
নিট কাপড়ের কিছু কথা	সৈয়দ মোঃ আজিজুর রহমান	৯
ব্যাবিলন ট্রেনিং সেন্টার	রেবেকা সুলতানা	১০-১১
স্বপ্নের সেন্ট-মার্টিনে একদিন	উম্মে সালমা ডালিয়া	১২
দম্পতি	এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌ই চৌধুরী	১৩-১৫
সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যাবিলন	এম.এম. তোফাজ্জল হোসেন	১৬
প্রতিদিনের রোজ নামচা	মুহাম্মদ সাইফুল হক	১৭-১৮
এইটা আবার কোন তেল?	মোঃ রাকিবুল ইসলাম	১৯-২০
প্রয়োজন আত্ম শুদ্ধির	মোঃ রফিকুল ইসলাম	২১
অনুভূতির উপলব্ধি	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	২২-২৩
কি রাগিনী বাজালে হৃদয়ে	এমদাদুল ইসলাম	২৪-২৫
অপেক্ষা	আখতারুজ্জামান (সাগর)	২৬
সুধীজন	মোঃ ফজলুল করীম	২৬
আমাদের কথা	মোঃ সাইদুল হক (মিতন)	২৭
বর্তমান	মোঃ বদিউল আলম	২৭
প্রিয় ব্যাবিলন কথকতা	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	২৮-২৯
ব্যাবিলনের গান	জন সুমিত দেউড়ী	৩০
ব্যাবিলন গ্রুপের বিবিধ কার্যক্রমের ছবি		৩১-৩২

পরিচালকবৃন্দের শুভেচ্ছা বাণী

মইনুল আহসান
পরিচালক, অর্থ ও হিসাব

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ

নিসার আহমেদ
পরিচালক, আমদানি ও প্রশাসন

আবিদুর রহমান
পরিচালক, রপ্তানী

'ব্যাবিলন কথকতা' এর দ্বিতীয় সংখ্যা আত্ম প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি। অনেক সুন্দর প্রচেষ্টা অঙ্কুরে ঝরে যায়। এ ক্ষেত্রে তা হয়নি এটা খুবই আশার কথা। এই ম্যাগাজিনের সাথে যারা গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছেন তাদের সবার দৃঢ় প্রত্যয়, প্রচন্ড অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম ম্যাগাজিনটিকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে।

পত্রিকাটির লেখক-লেখিকা, এর সার্বিক ব্যাবস্থাপনা, কারিগরী দেখাশুনা যারা করেছেন তাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। আমরা 'ব্যাবিলন কথকতা' এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও এর অব্যাহত জয়যাত্রা কামনা করি। ব্যাবিলনের সার্বিক সাফল্যের প্রেরনা হোক ব্যাবিলন কথকতা। 'ব্যাবিলন কথকতা' কে ধন্যবাদ।

আব্দুস সালাম
পরিচালক, উৎপাদন

সম্পাদকীয়

চোখের পলকে যেন **'ব্যাবিলন কথকতা'** এর প্রথম বর্ষ পূরণের সময়টা এসে গেল। এ এক ভিন্ন ধরনের ভাললাগা। এমন এক অনুভূতি - আমার এবং ব্যাবিলন পরিবারের সকলের - যা প্রকাশসাধ্য নয়। যেন সেই দিন প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন হল। আজ আবার বছর পেরিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করল। স্বীকার করছি সদ্য প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাটি হাতে পেয়ে আপনাদের অনেকের মতো আমারও সংশয় হয়েছিল - রুগ্ন এই শিশুটি টিকে থেকে আদৌ তার পুনঃজন্ম প্রত্যক্ষ করতে পারবে কিনা। পারল শেষ পর্যন্ত, তাই না !

সম্পাদকের পাতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রেওয়াজ রয়েছে। তবে সেই প্রথা রক্ষার্থে নয়, সত্য প্রকাশের তাগিদেই বলছি - কত জনের কাছেই না **'ব্যাবিলন কথকতা'** ঋনী হয়ে গেছে এই স্বল্প পরিসরে। নানান দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি অঙ্গে ধারণ করে প্রথম সংখ্যাটি যে পরিমাণ প্রশংসা, উৎসাহ ও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পেয়েছে এর পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে, তার দায় **'ব্যাবিলন কথকতা'** কোনদিনই শুধতে পারবেনা।

'ব্যাবিলন কথকতা' - এর প্রথম সংখ্যাটিতে যারা লিখেছিলেন তাদের অনেককেই এবারেও পাওয়া যাবে সামনের পাতা গুলোতে। ব্যাবিলন পরিবারের এই সব লেখক-লেখিকা, সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই হৃদয় ছোঁয়া কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। লেখক - লেখিকার তালিকায় এবার যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানাই সুস্বাগতম। আপনাদের ও অনাগত দিনে আরো নতুন লেখক-লেখিকাদের লেখা সমৃদ্ধ হয়ে **'ব্যাবিলন কথকতা'** তার গর্বিত অগ্রযাত্রা বজায় রাখবে এইটি আশা করি।

প্রথম সংখ্যার দুর্বলতাগুলোকে যতোটা সম্ভব কাটিয়ে ও এবারের সংখ্যাটিকেও সময়মতো প্রকাশের পেছনে যাদের অবদান অসামান্য তাদের কথা এখানে না বললেই নয়। পত্রিকা কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য সাইফুল হককে আসলে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই। সে পত্রিকার জন্ম থেকে এই পর্যন্ত এর সাথে তার অস্তিত্বটাই মিলিয়ে দিয়েছে। তবে ওর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা অবশ্য আমাকে করতেই হবে।

ব্যাবিলন পরিবারের অপেক্ষাকৃত নবীন সদস্যা অফিসের ফ্রন্টডেস্কের সোহেলীর অবদান আমার প্রত্যাশাকে অতিক্রম করেছে। এতটুকু একটি মেয়ে যে রকম দৃঢ়তা ও সাবলীলতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে সম্পাদনার কাজে সহায়তা দিয়েছে তা সত্যি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

কি আশ্চর্য্য দেখুন - স্বাধীনের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। আমাদের ট্রেন্ডজখ্যাত ডিজাইনার স্বাধীনের কথাই বলছি। প্রথম সংখ্যার মত এবারেও **'ব্যাবিলন কথকতা'** - এর প্রচ্ছদ অংকন থেকে শুরু করে এর সার্বিক অলংকরণ সেই করেছে। স্বাধীন এগিয়ে না এলে **'ব্যাবিলন কথকতা'** কার অধীনে যে সাজ খুঁজতো কে জানে।

সোনিয়া ইসলামকে ভুলে যাননি নিশ্চই ? **'ব্যাবিলন কথকতা'** - এর প্রথম সংখ্যার বাস্তব রূপদানে তার জুরিহীন অবদানের কথা সেই সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই উল্লেখ করেছিলাম। এবারেও সোনিয়াকে আমরা পাশে পেয়েছিলাম পত্রিকাটির প্রতি তার বিশেষ অনুরাগের কারণে। ছড়া-কবিতা বিভাগের সবগুলো রচনাই সোনিয়া অনেক যত্নে ও আদরে সাজিয়ে দিয়েছে। তাকেও ধন্যবাদ দিয়ে দুরে সরাতে চাই না। **'ব্যাবিলন কথকতা'** এর যে এখনো অনেক পথ চলা বাকী।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, টের পেয়েছিন কি এবারের সংখ্যায় ব্যাবিলন পরিবারের সবার জন্য যে একটা বিশেষ চমক রয়েছে? 'ব্যাবিলনের গান' - এই পরিবারের আরেকটি স্বপ্ন পূরণ। প্রতিটি ব্যাবিলনিয়াণ এই গানের বাণীতে ব্যাবিলনের প্রতি তার কমিটমেন্ট, আস্থা ও তাকে নিয়ে ব্যাবিলনের বা ব্যাবিলনকে নিয়ে তার অপার সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাবেন এমনটা আশা করেই এই প্রয়াস। প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে তার বিচারক আপনারাই। 'ব্যাবিলনের গান' আমাদের আগামী দিনের পথ চলায় অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে টিকে থাকুক এই কামনা করি।

পরিশেষে সবাইকে জানাই মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা! শুভেচ্ছা পবিত্র ঈদুল আজহা ও বড়দিনের। সবাই খুব ভাল থাকুন আর অপেক্ষায় থাকুন ইংরেজী নতুন বছরে নতুন কোন চমকের। HAPPY NEW YEAR 2008 !

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, বিপণন ও মান নিয়ন্ত্রণ

তারিখ : ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭

শুভেচ্ছা

সোনিয়া ইসলাম
প্রাক্তন ওয়েলফেয়ার অফিসার, বি.জি.এল.

'ব্যাবিলন কথকতা' ভুলে গেছো আমায়? আমি তোমাদেরই একজন। না না ভুল বললাম। একজন ছিলাম। তোমার হৃদয়ের সাথে একাকার হয়েছিল আমার অস্তিত্ব। অস্তিত্বও বিলীন হয়।

বড় অনাড়ম্বরে তোমরা আমায় বিদায় বলেছিলে। বিদায় শব্দটা বড় অসহ্য রকম কষ্টের। আমি প্রশ্ন করেছিলাম অনুভূতির কাছে। অনুভূতিগুলি কি বলেছে জান? যারা বিদায় বলেছে তারা যথেষ্টরকম মিথ্যেবাদী। জানতে চেয়েছিলাম একাকীত্বের কাছে– কি হল? কথা বলছ না যে! একাকিত্বও নিশ্চুপ ছিল তোমার মত। কষ্টগুলোকে বলেছিলাম– শুনছ, চলে যাচ্ছি । কষ্টগুলো অদ্ভুত উত্তর দিয়েছে। বলেছে, আমার প্রিয় রং কালো ।

পুরানের বিদায়ের সাথে সাথে নতুনের জায়গা নিশ্চিত হয়। ব্যাবিলন কথকতা তোমার সব নতুনের জন্য আমার হৃদয় নিংড়ান শুভ কামনা। কষ্ট হচ্ছে তোমার 'ব্যাবিলন কথকতা' ? মন খারাপ করনা। নতুনের আগমন বিদায়ের কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। এটাই সৃষ্টির খেলা।

ওমা, তোমার চোখে জল! কাঁদছ তুমি? চেয়ে দেখ ইউকেলিপ্টাস গুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি যাযাবর হয়েছে বিদায়ের যন্ত্রনায়। তবে ওরা আবার ফিরে আসবে বসন্তের রং নিয়ে তোমার ধরায়। তুমি ভাবছ বসন্তের রং দিয়ে কি হবে? রং দিয়ে বর্ণগুলো সাজবে। সেজে ওরা শুভেচ্ছা হবে। তোমার জন্য, তোমাদের নতুন জীবনের জন্য। 'ব্যাবিলন কথকতা' কোন বিদায়, কোন কষ্ট, কোন দুঃস্বপ্নই যেন তোমার এগিয়ে যাবার পথকে দুর্গম করতে না পারে। তোমার স্বপ্ন পূরনের, তোমার নতুন জীবনের জন্য এই বিদায়ী সাথীর একরাশ শুভেচ্ছা। মন খারাপ করলে ? কম হয়ে গেল বুঝি! যাও, এক হৃদয়ের সমস্ত শুভেচ্ছা। কৃপণতা থেকেই যাচ্ছে। ঠিক আছে এক সমুদ্র শুভেচ্ছা। তুবও যেন মন ভরছে না। যাও এক মহাসমুদ্র শুভেচ্ছা । তাও হলনা ? তোমার জন্য 'ব্যাবিলন কথকতা' এক মহাবিশ্ব শুভেচ্ছা।

সাগর পাড়ের জীবন

মোঃ শহীদুল ইসলাম
অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং, হেড অফিস

সাগর পাড়ের মানুষ মোরা
থাকি মাটির ঘরে,
দুমড়ে মুচড়ে পড়ে সে ঘর
কাল বোশেখীর ঝড়ে।

ঘরের চাল উড়ে গিয়ে
বসে গাছের শাখায়,
আবার মোরা গড়ি নীড়
মাথা গোঁজার আশায়।

জলোচ্ছাস যখন তখন
ভাসায় মোদের ভেলায়,
পানি নেমে গেলে পরে
বাঁচলে ফিরি বাসায়।

দুঃখে ভরা জীবন মোদের
দুঃখ নিত্য সাথী,
একটু খানি সুখের আশায়
আমরা বেঁচে আছি।

একুশ

সেখ মোঃ অয়েজ হোসেন
কাটিংম্যান, অবনি ফ্যাশন্স লিঃ

একুশ তুমি রক্তজবা
লাল পলাশের গান,
ভাষার তরে রফিক সালাম
করল জীবন দান।

মাতৃভাষা বাংলাভাষা
মোদের গর্ব মোদের আশা
সারা জীবন রাখবো ধরে
এই ভাষারই মান।

বাংলাভাষা ছিনিয়ে আনতে
দিলেন যারা প্রাণ,
তাদের জন্য রচব মোরা,
হাজার ছড়া গান।

মাতৃভাষা বাংলা আমার
মায়ের কাছে পাওয়া
এই ভাষাতেই ব্যক্ত করি
মনের সকল চাওয়া।

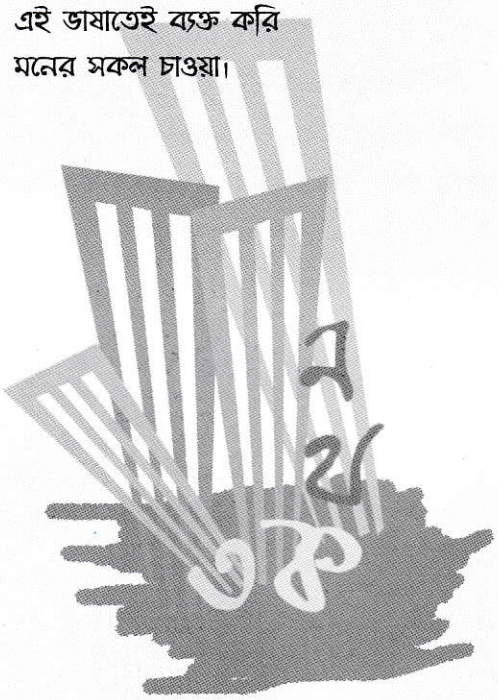

ব্যাবিলন কথকতা

মোঃ নুরুল ইসলাম
কিউ.সি.আই., বি.জি.এল

হে, ব্যাবিলন কথকতা
তোমাকে জানাই সাদর সম্ভাষন
তোমাকে ঘিরে রয়েছে
আমাদের নানা আয়োজন।

কেন তুমি আস বছর পরে ?
আসিতে কি পার না ক্ষনে ক্ষনে
প্রতি মাসে মাসে ?

তুমি এলে হৃদয়ে তৃষ্ণা জাগে
মন ছুটে চলে তেপান্তর এর পথে,
ইচ্ছে করে কবি হতে,
তোমার কাছে লেখা পাঠিয়ে।

তুমি কি ছাপাবেনা এই কথা ?
হে, ব্যাবিলন কথকতা।

গভীর ব্যথা

মীর আরিফ রানা (স্বপন)
সুপারভাইজার, ব্যাবিলন প্রিন্টিং

ছন্দ তুলে নদী চলে
কোন সে পথে ধায়,
মনের কথা বলে নাকো-
কোন সে ব্যথা হায়!

ছন্দ যখন হারিয়ে ফেলে
নদী তখন থামে,
হঠাৎ ক্ষেপে অমনি তখন-
কূল কেন তার ভাঙ্গে ?

ভাঙ্গছে যখন কূল গুলো তার
গড়বে কালে সবই,
গড়ার আগে সইতে হবে-
সকল ব্যথা আজই।

ভুলতে গেলে যায় না ভোলা
ঝর্ণা ধারার স্মৃতি,
জন্ম হলো ঝর্ণা যদি
আজকে কেন নদী ?

ভাবতে গিয়ে নদী যখন
নিথর হয়ে থামে,
আকাশের মেঘগুলো হায়-
কান্না হয়েই ঝরে।

ছুটছে নদী ব্যথা বুকে
সুরের মূর্ছনায়,
ঢেউ গুলো তাই খুঁজে ফেরে
সুখের মোহনায়।

মুক্তিযুদ্ধ

মোঃ ফেরদৌস
অফিসার, আর এন্ড ডি

মুক্তিযুদ্ধ, তুমি নও শুধু যুদ্ধ
তুমি বাঙ্গালী জাতির
মুক্তির ইতিহাস।

মুক্তিযুদ্ধ, তুমি নও শুধু
মুক্তি যুদ্ধের গান
তুমি সন্তান হারা
লাখো জননীর হাহাকার।

মুক্তিযুদ্ধ, তুমি নও শুধু
বুলেট, বোমা, ট্যাংক,
তুমি তিরিশ লক্ষ শহীদের
রক্তে ভেজা নাম।

মুক্তিযুদ্ধ, তুমি নও শুধু
স্বপ্নের জাল বোনা
তুমি আমাদের স্বপ্নের
বাস্তব প্রতিফলন।

কে আমি ?

কামরুল আহসান অপু
অফিসার, মার্চেন্ডাইজিং, হেড অফিস

নই আমি সুকান্ত, নই নজরুল
আমি ব্যাবিলনে ফোঁটা
নাম না জানা ফুল।

আমি অতীত নই, সুদৃঢ় বর্তমান
ব্যাবিলনকে ঘিরেই পরিপূর্ণ
আমার আপন ভুবন।

আমি স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন রচি
রবির আলোয় সেজেছে আমার
প্রিয় ব্যাবিলন।

আমি তরল নই, নই খুবই কঠিন
আমি চির উন্নত শিরে
গাহি সাম্যের গান।

আমি সুরভী ছড়াই আপন মহিমায় -
আমি ব্যাবিলনের
রুখবে কে আমায় ?

মা তোমাকে ভালবাসি

মোঃ শাহীন রেজা
ফিনিশিং কিউ.সি, বি.জি.এল-২

শোন মাগো একটি কথা,
তোমায় ভালবাসি।
অন্তরে মোর জ্বালায় প্রদীপ,
তোমার মুখের হাসি।

তুমি যদি হাসো মাগো,
সব কিছু যে হাসে।
কাঁদলে তুমি পৃথিবীটা,
অন্যরূপে সাজে।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ তুমি,
তোমার চাঁদের হাসি।
শোন মাগো শেষ কথাটি,
তোমায় ভালবাসি।

আমার দেশ

খাদিমুল ইসলাম
অডিটর (কিউ.সি.), বি.ডি.এল.

ধরনীর বুকে খুঁজে ফিরি এমন এক দেশ
যেখানে পাখির কলতানে রাত্রি হয় শেষ।
প্রথম রবির কিরণ যখন পড়ে সবুজ ঘাসে
চিকচিক শিশির বিন্দু দোলে বাতাসে।

নানান রঙ্গের ফুলগুলো সব নাচে হিমেল হাওয়ায়
ভ্রমররাও মেতে ওঠে ফুলের সাথে খেলায়।
শেষ বিকেলে গোধূলির আলো পড়ে নদীর বুকে
ভাটিয়ালী গান গেয়ে মাঝি দুর অজানায় ছোটে।

এত রঙ্গের রূপে ভরা জানো সে কোন দেশ ?
সে আমারই মাতৃভুমি, প্রিয় বাংলাদেশ।

সে এসেছিল

কোয়েল তালুকদার
মেডিক্যাল এসিঃ, এ.কে.এল

মনে হয় সে এসেছিল
সমস্ত রাত্রি পার করে
যখন চলে যাবার সময় তার
আমি তখনি জানতে পারলুম
সে এসেছিল।

সমস্ত রাত আমায় নিঃশেষ করে
যখন সে চলে যেতে প্রস্তুত
তখনি আমি জানলাম
সে এসেছিল।

যখন জানলাম তখন।
সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে।
তাই হাত বাড়ালাম তার দিকে,
রাতভর সুরা পান করে
মোটা সোটা দেখালেও-

আমার আঙ্গুলের ভর
সে সইতে পারল না
সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেল
শুধু পড়ে রইল দেহাবশেষ
ছোট একটি মশার।

নিট কাপড়ের কিছু কথা

সৈয়দ মোঃ আজিজুর রহমান
এ.জি.এম, অবনী টেক্সটাইলস লিঃ

আদিম যুগ থেকে সভ্যতার বিবর্তনের পথ ধরে এক সময় মানুষ তার লজ্জা নিবারনের জন্য বস্ত্র আবিষ্কার করে। গাছের পাতা-ছাল, পশুর চামড়া প্রভৃতি ছিল মানুষের আদিমতম পোষাক। সময়ের সাথে সাথে তন্তুর সন্ধান লাভ এবং তা থেকে সূতা তৈরীর কৌশল রপ্ত হয়ে যায় মানুষের। পরবর্তিতে সূতা থেকে কাপড় বুনন। সূতা থেকে কাপড় তৈরীর কৌশলও মানুষ বের করে ফেলে এক সময়। দুটি মূল প্রক্রিয়ায় মানুষ কাপড় বুনতে শেখে। একটি হল উইভিং (weaving) প্রক্রিয়া, আরেকটি হলে নিটিং (knitting) প্রক্রিয়া। আমরা এখানে নিট কাপড় কিভাবে তৈরী হয় সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করব।

ওভেন (woven) কাপড়ের মতই নিট কাপড়েরও রয়েছে নানা বৈচিত্র। সূতা (yarn) থেকে নিট কাপড় তৈরী হয় মূলতঃ দু ধরনের নিটিং মেশিনের মাধ্যমে। এর একটি হল সার্কুলার (circular) নিটিং মেশিন আর আরেকটি হল ফ্ল্যাট (Flat) নিটিং মেশিন। নিট কাপড় থেকে পোষাক তৈরির মূল কাপড়টি সাধারনতঃ তৈরি হয় সার্কুলার নিটিং মেশিনে। এই মেশিনে বুনন পদ্ধতিতে বৈচিত্র এনে তৈরি করা হয় নানা ধরনের নিট কাপড়। এগুলো হলো - সিংগেল জার্সি, ডাবল জার্সি বা ইন্টারলক, পোলোপিকে, সিংগেল লাকস্ট, ডাবল লাকস্ট, রিব, ইলাস্টেন জার্সি, ইলাস্টেন লাকস্ট প্রভৃতি। ফ্লাট নিট মেশিন দিয়ে তৈরি হয় কলার, কাফ ইত্যাদি।

কটন (cotton), পলিয়েস্টার (polyester) বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আঁশ নির্ভর সূতা দিয়ে বিচিত্র রঙ্গে, ঢঙে ও ডিজাইনে তৈরী হয় নিট কাপড়। নিটিং মেশিন থেকে বুনন হয়ে নেমে আসা কাপড় দেখলে ভাল লাগবে না মোটেই। কিন্তু এই সদ্য বোনা কাপড়কে মেশিনে নানান রাসায়নিক পদার্থ ও পানি সহযোগে কেঁচে ধুয়ে যখন বাহারী সব রঙে রাঙানো হয় তখন কিন্তু অন্য কথা। কাপড়ের রং করার পর্যায়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ন।

নিট কাপড় রং (dye) করার জন্যে আজকাল রয়েছে অত্যাধুনিক সব ডাইং মেশিন। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান সহ বিশ্বের নানান দেশে তৈরি হয় নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং মেশিনারী।

ডাইং মেশিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেশিন নির্মাতারা হলো - স্কলাভোস, থীস, পোল, ডেলমিনলার, ডেনে' ইত্যাদি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের রঞ্জক ও রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে ঐ সব মেশিনে রাঙানো হয় নিট কাপড়। তিনটি মৌলিক রং - লাল, নীল ও হলুদ দিয়ে তৈরি করা যায় হাজার হাজার, লাখ লাখ, কোটি কোটি রঙ বৈচিত্র। কাপড়ের উপাদান ভেদে তা রঙ করার জন্য ব্যবহার করা হয় ভিন্ন ভিন্ন রঞ্জক। যেমন কটনের জন্য রিঅ্যাকটিভ, পলিয়েস্টারের জন্য ডিসপার্স ও নাইলনের জন্য এসিড ডাইস। সাধারনতঃ এক্সহস্ট (exhaust) পদ্ধতিতে নিট কাপড় ডাই করা হয়।

ডাইং এর পরে বিভিন্নরকম ফিনিশিং প্রক্রিয়ার গুরুত্বও কম নয় নিট পোষাকের ফ্যাশন জগতে বৈচিত্র আনার জন্য। বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করে ফিনিশিং প্রসেসের মাধ্যমে নিট কাপড়ে নানান গুনাবলী প্রদান করা যায়। সেই রকম কিছু কাপড় হলো - ওয়াটার রিপেলেন্ট কাপড় - যা পানিতে ভেজে না, ইজি কেয়ার ফ্যাব্রিক্স - যে কাপড় সহজে কুঁচকায় না। এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ফিনিস - যে কাপড়ে সহজে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু আক্রমন করতে পারে না। ইউ.ভি প্রটেকটেড ফ্যাব্রিক্স - যে কাপড় মানবদেহকে সূর্য্যের ক্ষতিকর অতি - বেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে। এ্যারোমেটিক ফ্যাব্রিক্স বিশেষ সুগন্ধি কেমিক্যাল প্রয়োগে সুগন্ধি কাপড় তৈরী হয়। উইকিং ফিনিশ বা ময়েশ্চার অ্যাবজরবেন্ট ফ্যাব্রিক্স - এই কাপড় শরীর থেকে ঘাম শোষণ করে অতি সহজে।

আরেক বিশেষ ধরনের নিট কাপড় হলো ইলাস্টেন ফ্যাব্রিক্স। ইলাস্টেন মিশ্রিত কাপড়ের নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। সহজে সম্প্রসারিত হওয়া এই কাপড় প্রসেসে হীট সেটিং খুবই জরুরী।

আটপৌড়ে (casual) পোষাক তৈরীতে ও ক্রীড়াবিদদের পোষাক প্রস্তুতিতে নিট কাপড়ের চাহিদা ও ব্যবহার ব্যাপক। নিট কাপড়ে তৈরী পোষাক বৈচিত্র্যময়, অথচ অপেক্ষাকৃত সস্তা ও দারুন আরামদায়ক হওয়ায় বিশ্ব বাজারে এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নিট কাপড় তথা নিট পোষাকের জয় হোক!

ব্যাবিলন ট্রেনিং সেন্টার

রেবেকা সুলতানা
প্রশিক্ষণ সমন্বয়ক, ট্রেনিং সেন্টার, বি.জি.এল।

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্নের পরেই বস্ত্রের স্থান। উন্নত বিশ্বের বস্ত্র বা পোষাকের চাহিদা পূরন করে থাকে অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষেরা। বিশ্ব বাজারে রপ্তানীমুখী পোষাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে তৈরী পোষাক রপ্তানী করে। দেশে তৈরী পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই নারী। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত নারী-পুরুষ কর্মী অধ্যুষিত দেশের এই সর্ববৃহৎ শিল্পটি অপার সম্ভাবনাময়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পারে এই শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ কর্মীর কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দিতে অনেকখানি। ফলে নতুন বিনিয়োগ ব্যাতিরেকেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমুহ থেকে অধিকতর উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে।

ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ এই ব্যাপারে একটি পথিকৃৎ। ব্যাবিলন তার নিজ কর্মী বাহিনী তথা সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের ক্রম প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে অনাড়ম্বর ভাবে কারখানার অভ্যন্তরে একটি শ্রমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে। সেই কেন্দ্রটিই ২০০১ সালের ২০ মে তারিখে ব্যাবিলনের নিজস্ব ভবনের উপরতলায় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। সুপরিসরে ১৫টির মত সেলাই মেশিন, পর্যাপ্ত আসবাব ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ উপকরণ সহ নতুন ভাবে ব্যাবিলন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয় ঐ দিন থেকে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি আমাকে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রথম স্বীকৃত প্রশিক্ষিকার দায়িত্বভার দেয়ার জন্য।

ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতা ও আমার সীমিত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমি তারপর থেকে আমার সাধ্যমত চেষ্ঠা করে আসছি সার্থকভাবে ট্রেনিং সেন্টারটির কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যেতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইতোমধ্যে ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিটি মুখ্য উৎপাদন কারখানায় একটি করে অনুরুপ শ্রমিক-কর্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

*** কাদের জন্য প্রশিক্ষণ ?**

শিক্ষানবীশ থেকে শুরু করে দক্ষ শ্রমিক - সবার জন্যই এই প্রশিক্ষণ। শিক্ষানবীশদের ট্রেনিং কাল ৩ মাস দীর্ঘ। অন্যদিকে শিক্ষানবীশ ট্রেনিং প্রাপ্ত বা পুরনো কর্মীদের জন্য এক সপ্তাহ ব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

*** কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ?**

শিক্ষানবীশদের প্রশিক্ষণের বিষয়মালা বেশ ব্যাপক। তিন মাস ধরে এরা অনেক কিছুই শেখার সুযোগ পায়। প্রশিক্ষণ কালে এরা ১২০০ টাকা (এক হাজার দুই শত টাকা) করে মাসিক ভাতা পায়। এই সময়টিতে এদেরকে কোন বাড়তি সময় (Overtime) কাজ করতে হয় না।

শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ সূচীতে রয়েছে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো -

১) অক্ষর জ্ঞান (যখন প্রযোজ্য)। ২) কর্মীদের অধিকার সমূহ ৩) কোম্পানীর নিয়ম-কানুন ৪) শিষ্টাচার ৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ৬) স্বাস্থ্য সচেতনতা ৭) আপৎকালীন জরুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৮) সেলাইয়ের খুঁটিনাটি ৯) গুণগতমান ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর তত্ত্বীয় ক্লাশের বাইরে সকল প্রশিক্ষনার্থীদের প্রতিদিন নিয়ম করে সেলাই মেশিনে বসিয়ে

সেলাই, মেশিন পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে – স্বাস্থ্য সচেতনতা, আচার-আচরন, নিরাপত্তা, সম্ভাব্য অগ্নিকান্ডে করনীয় ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের জরুরী ব্যবহার, শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যাবস্থা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ছুটিসহ কর্মীদের নানারকম প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, নিম্নতম মজুরী ইত্যাদি।

উপরোক্ত দুই শ্রেনীর প্রশিক্ষণের বাইরেও সেলাই মেশিনের কর্মীদেরকে তাদের প্রশিক্ষণ ঘাটতি নিরুপন করে সেই অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও রয়েছে।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সার্বিক সচেতনতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। এতে করে কোম্পানী ও কর্মী উভয়েই লাভবান হয়। ব্যাবিলনের বাইরেও ব্যাবিলন কর্মীদের গ্রহনযোগ্যতা ও সমাদরের বিষয়টা থেকে কারোরই বুঝতে না পারার কথা না – পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পরবর্তিতে তার সুপ্রয়োগ কর্মীদেরকে কতটা সম্মান ও স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে পারে।

পরিশেষে আমি ব্যাবিলন কর্তৃপক্ষ, ব্যাবিলন প্রশিক্ষণের কেন্দ্র থেকে এ যাবৎ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হাজার হাজার কর্মী ভাই-বোন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ব্যাবিলনে কর্মরত সকল ব্যাবস্থাপক-কর্মকর্তাদেরকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। সেই সঙ্গে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে ব্যাবিলনের মত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানেও যাতে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এতে সেই সব প্রতিষ্ঠান, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। বাংলাদেশের সম্মান পৃথিবীর বুকে সমুন্নত হবে।

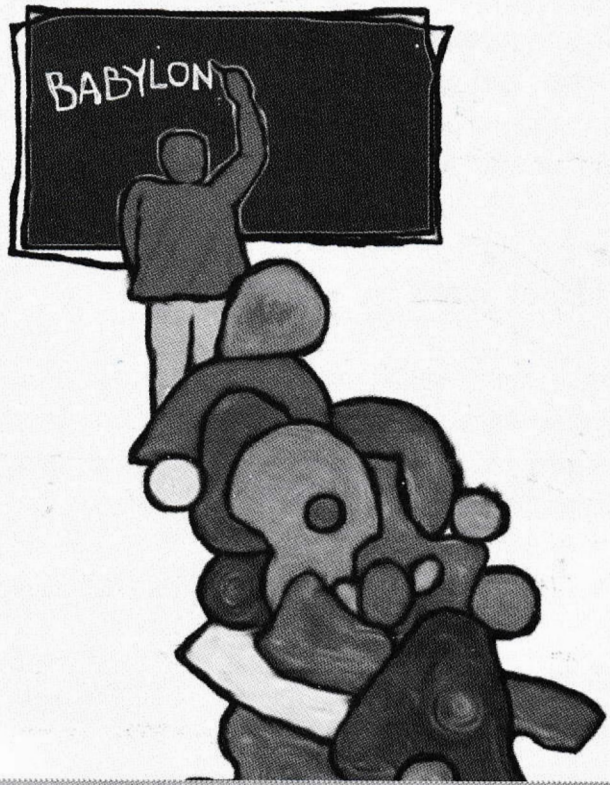

স্বপ্নের সেন্ট-মার্টিনে একদিন

উম্মে সালমা ডালিয়া
সহকারী ব্যাবস্থাপক, প্যাটার্ন সেকশন

বাংলাদেশের একমাত্র কোরাল বা প্রবাল দ্বীপ হচ্ছে সেন্ট-মার্টিন। আমরা সেন্ট মার্টিনকে নীল সমুদ্রের দেশ বলে জানি। ক্যাপটেন মার্টিন নামে একজন বৃটিশ সেইন্ট এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। উনার নামানুসারে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয় সেন্ট মার্টিন। যেখানে কিনা জীবিত এবং মৃত সবধরনের প্রবাল পাওয়া যায়। এই দ্বীপের চারিদিকে প্রচুর প্রবাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই অসম্ভব সুন্দর নয়নাভিরাম দ্বীপ পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই বছরের মার্চ মাসে।

আসলে কর্ম - ব্যস্ততার কারণে অনেক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ঢাকার বাইরে তেমন কোথাও যাওয়া হয় না। অফিস থেকে বেড়াতে যাবার জন্য ছুটি পেলাম দুই দিনের এবং ২৬শে মার্চের ছুটি এক দিন মোট এই তিন দিনের ট্যুরে ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে প্রথমে গেলাম কক্সবাজার এবং সেখান থেকে একটা প্যাকেজ ট্যুর কোম্পানীর সাথে এক দিনের প্রোগ্রামে সেন্ট মার্টিন।

সেন্ট-মার্টিন এ যাতায়াত ব্যবস্থা আগে খুব একটা ভালো ছিল না। অনেকের মুখে তীক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমরা খুবই ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু যে দিন রওনা করলাম সেদিন দেখলাম যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভালো হয়েছে এখন।

খুব সকালে প্যাকেজ ট্যুর কোম্পানীর গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে গেল টেকনাফ। সেখান থেকে ছোট জাহাজে করে সেন্ট-মার্টিন। তিন ঘন্টা পর স্বপ্নের সেন্ট-মার্টিনে পৌঁছে গেলাম। সেন্ট-মার্টিনের আয়তন ১৫/১৬ বর্গকিলোমিটার। এখানকার বেশির ভাগ লোক মুসলিম সম্প্রদায়ের। এদের প্রায় ৫,৫০০ অধিবাসীর অধিকাংশই পেশায় জেলে।

বর্তমানে এই দ্বীপ পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষনীয় এবং সুন্দর স্থান। আমাদের দেশের মানুষও প্রচুর বেড়াতে আসে এই দ্বীপে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। এই দ্বীপে বেড়ানোর সঠিক সময় হচ্ছে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এখানে বেশ কিছু হোটেল এবং গেষ্ট হাউস আছে। সেন্ট-মার্টিনের পানি হচ্ছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ এবং বীচটা খুবই সুন্দর। আর এখানে সমুদ্রের পানি হচ্ছে নীলাভ সবুজ। যা এত সুন্দর যে না দেখলে লিখে বোঝানো যাবে না। একদম ছবির মতো এই দ্বীপে আরও আছে প্রচুর নারিকেল গাছ। এ কারণেই এই দ্বীপের আর একটা নাম হচ্ছে নারিকেল জিঞ্জিরা।

আমরা দুপুরে একদম টাটকা রুপচাঁদা মাছ এবং কোরাল মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেলাম যার স্বাদ খুবই চমৎকার। আমরা শহরে যে রুপচাঁদা মাছ পাই সেটা থেকে ঐ মাছ অনেক মজাদার।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ বীচের অপরুপ সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। বেলা পড়ে আসার আগেই রওনা দিলাম জাহাজের উদ্দেশ্যে। আমাদের গাইড আমাদেরকে পুরো সেন্ট-মার্টিন ঘুরালেন বীচ ধরে। হাঁটতে ভালোই লেগেছে কিন্তু আমাদের টিমে বেশ কিছু বাচ্চা এবং বয়স্ক লোক ছিল তাদের খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু অবশ্যই কারও কোন অভিযোগ ছিল না। বরং সবাই উপভোগ করেছে সময়টুকু।

আসলে সেন্ট-মার্টিন দ্বীপকে ভালোভাবে উপভোগ করতে হলে একদিন যথেষ্ট নয়, কমপক্ষে দুই দিন দরকার।

এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দ্বীপটি আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ এটা ভাবতেই ভালো লাগে। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের অবশ্যই এই দ্বীপের অপরুপ সৌন্দর্য উপভোগ করা উচিত।

দম্পতি

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল, হেড অফিস

তারা বণিকের মেয়ের আজ বিয়ে হয়ে গেল। তারা বণিকের নিজের গ্রাম রসুলপুর তো দুরে থাক আশপাশের দশ গ্রামে এমন ধুমধাম রাজকীয় বিয়ে কেউ দেখেছে বলে মনে হয়না। আর ধুমধাম করে বিয়ে হবেই বা না কেন ? "এক বাপের এক মেয়ে বিয়ে দাও খেয়ে না খেয়ে" এ প্রবাদ পুরোপুরি সত্য করতে চেয়েছেন হাসিনা বানুর (সংক্ষেপে হাসি) পিতা তারা বণিক। মেয়ের বিয়েতে কোন কার্পণ্য করেননি তিনি।

বিয়ের জাঁকজমক অনুষ্ঠান, গুরুভোজ এসব শেষ হওয়ার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখল সবাই। সবাই চোখের জলে সিক্ত হয়ে (কেউ কেউ হাউমাউ করে কেঁদে) হাসিকে বিদায় দিল। মেয়েকে পালকিতে তুলে দেয়ার আগে পরিচিত সেই দৃশ্য সবাই আর একবার অবলোকন করল। তারা বণিক জামাইবাবুর হাতখানা মেয়ের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন–

–বাবা বড় আদরের মেয়ে। নিজের মেয়ে বলে বলছিনা, হাসি–মা আমার বড় লক্ষী । জীবনে বড় আঘাত তো দুরে থাক একটা ফুলের টোকা পর্যন্ত ওর গায়ে লাগতে দেইনি। আমার এই কলিজার টুকরাকে আজ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। কথা দাও বাবা – কোনদিন ওকে মারধোর, গালমন্দ করবেনা। কথা দাও--- কথা---

তারা বণিক আবেগাপ্লুত হয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। জামাইবাবু অর্থাৎ রতন মিয়া বিরাট বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। তার শ্বশুরের কথায় সে মহা বিরক্ত। ব্যাটার কথা শুনে মনে হচ্ছে মানুষ বিয়ে করে কেবল বউকে মারধোর আর গালমন্দ করার জন্য। এরই মধ্যে তারা বণিকের হাহাকার যেন দুধাপ উঁচুতে উঠল। অগত্যা শ্বশুরের কাছে স্ত্রীকে গালমন্দ আর মারধোর না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই বউ নিয়ে রতন নিজ বাড়ি ফিরল।

এরপর দেখতে দেখতে এক মাস নয় দিন পার হয়ে গেল। রতন আর হাসির সংসারের বয়সও বাড়তে লাগল। হাসিকে রতনের বেশ ভাল লেগেছে। নিজের বউকে নিয়ে অনেকের কাছে অনেক রকম প্রশংসাও করেছে সে। কখনও বলেছে হাসির রান্নার হাত ঠিক তার দাদীর মত। যে একবার ওর রান্না করা গো–মাংস ভুনা গরম ভাতের সাথে খাবে, সে নিজের হাতের আংগুল গুলোও অায়সা চাটা চাটবে যে হাতের চামড়া উঠে যাবে। রতনের মতে মানুষ খাবার খেয়ে তৃপ্তি পেল কিনা তা বোঝা যায় তার হাত চাটা দেখে।

যা হোক – বউকে নিয়ে এতটা আত্মতৃপ্তিতে থাকার পরও একটা ব্যাপারে তার মনের খটকা কিছুতেই দুর হয়না। ব্যাপারটা বিয়েতে সে তার শ্বশুরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা নিয়ে। বিয়ের দিন তার শ্বশুর তাকে অনুরোধ করেছিল যেন হাসির সাথে সে খারাপ ব্যবহার না করে। পরিস্থিতির চাপে সেদিন কথাও দিয়েছিল সে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। তার বউয়ের সাথে সে খারাপ ব্যবহার করবে না ভাল ব্যবহার করবে এটা নিতান্তই তার ব্যাপার। তার শ্বশুরের না। তাছাড়া বউয়ের সাথে সব সময় হুজুর হুজুর করে চললে মরদ মানুষের মর্দানী থাকে কোথায় ?

দুদিন আগে তার বন্ধু খোকন এর দেয়া একটা পরামর্শ তাকে আরও বিচলিত করেছে। এখানে জানিয়ে রাখা উচিত যে খোকনের বিয়ের বয়স পাঁচ বছর। বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ষোল কলা পূর্ণ না করলেও অন্তত দশ কলা পূর্ণ করেছে সে। তাই তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারেনি রতন। খোকনের সোজা সাপ্টা পরামর্শ –

–বউকে সবসময় কড়া কথার উপর রাখতে হবে। বউয়ের নরম কথায় গললে চলবে না বরং এর পেছনে কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা তা ভেবে নিতে হবে।

রতনের একটা সমস্যা হল, সে নরম মনের মানুষ। কারও সাথে অযথা রাগ করলে কিংবা রাগের অভিনয় করলে

তার হাসি পেয়ে যায়। এ ব্যাপারেও খোকনের পরামর্শ বেশ সোজা সাপ্টা–

–দেখ্, বিড়ালকে যদি তুই প্রথম থেকে শাসন না করে আজ মাছের কাঁটা খাওয়ার সুযোগ করে দিস তো দেখবি কাল তোর পাশে বসে থালা পেতে মাছের মাথা দাবি করছে। মেয়ে মানুষ হচ্ছে ঠিক এ রকম। আজ যদি চাঁদের মত একটা টিপ এনে দিস তো খুশি হবে কিন্তু দেখবি কাল চাঁদটাকে এনে দেওয়ার বায়না ধরেছে–

খোকনের অভিজ্ঞতা আর অকাট্য যুক্তি কোনটাকেই রতন অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু হাসির বেলায় কথাগুলো কতটুকু খাটে তা নিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত সে। এরকম দ্বিধা নিয়েই দিন কাটছিল রতনের। বহুবার সে হাসির সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে খুনসুড়ি, ঝগড়াঝাঁটি, বকাঝকা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই তার সমাপ্তি হয়েছে নিষ্ফল ভাবে। এরই মধ্যে একদিন অনভিপ্রেত একটা ঘটনা ঘটল।

বাজারে রতনের বড় একটা মুদি দোকান আছে। তারই গদিতে বসে রতন হিসাব পত্রের কাজ দেখে। সেদিনও সে যথারীতি কাজে মগ্ন ছিল। আর তার দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক শোল মাছ বিক্রেতা। হঠাৎ রতনের মনে হল হাসি সব ধরনের রান্নাইতো ভাল পারে কিন্তু শোল মাছের 'দো–পিঁয়াজি' কেমন রাঁধে তা একবার পরখ করে দেখলে খারাপ হয়না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে শোল মাছ কিনে দোকানের ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিল, আর বলল –

–তোর বিবি সাহেবকে বলবি যাতে সে এই মাছগুলো দিয়ে ভাল করে "দো–পিঁয়াজি" রান্না করে।

কদম (দোকানের সেই ছেলেটা) দেরী না করে বাসার পথ ধরল। কিন্তু একটা সুক্ষ্ম জিনিষ তার মগজে খেলে গেল। "দো–পিঁয়াজি" মানে তো দুই পিঁয়াজি, তার মানে কি মাছগুলান দুই জনের জন্য অর্থাৎ বড় ভাইজান আর বিবিসাবের জন্যই রান্না হবে? এটা সে কিছুতেই মানতে পারলনা। বাসায় এসে হাসিকে ডেকে সে প্রায় আদেশের স্বরে বলল–

– বিবিসাব, ভাইজান কইছে মাছগুলানরে "তে–পিঁয়াজি" করতে।

হাসির তো ওর কথায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাছের "দো–পিঁয়াজির" কথা শুনেছে কিন্তু "তে–পিঁয়াজির" কথা তো কখনও শুনেনি। কিন্তু ফিরতি প্রশ্ন করার ফুরসৎ কোথায়, কদম ততক্ষণে হাওয়া। অতএব কদমের রসিকতা ভেবে সে ব্যাপারটাকে আমল দিল না। মাছগুলোকে বিশেষ কোন তরকারী দিয়ে রেঁধে ফেলল।

ঘটনা ঘটল রাতের বেলা। রতন সবে মাত্র রাতের খাবার খেতে বসেছে। শোল মাছের "দো–পিঁয়াজি" না পেয়ে তার মেজাজে আগুন ধরে গেল। মিথেন গ্যাসের না বরং বলা ভাল হিলিয়াম গ্যাসের।

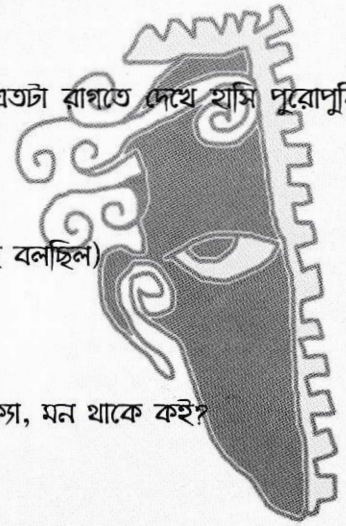

এমনিতে রতন ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু আজ ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার নিয়ে ওকে এতটা রাগতে দেখে হাসি পুরোপুরি ভড়কে গেল। ওদের কথপোকথনের ধরনটা ছিল অনেকটা এ রকম ----

– কি রে "দো–পিঁয়াজি" রাঁন্তে কইছিলাম না তোরে, এই সব কি রাঁনছস ?
(এমনিতে সে বউকে তুমি করে বলে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাগের কারণেই বোধহয় তুই বলছিল)

– তুমি এমন কইরা কথা কও ক্যান ?

– কেমন কইরা কথা কই আবার, তোরে যা কইছিলাম তা তোর গায়ে লাগল না ক্যা, মন থাকে কই?

– দেহ আমার লগে গালমন্দ করবা না!

– ক্যা – তোর বাপে নিষেধ করছে হেল্লেইগা ?
হাসি জবাব দিলনা। এ পর্যায়ে রতন ভীষন এক কান্ড করল। দড়াম করে ভাতের থালাটাকে ছুড়ে ফেলল। ঘটনার আকস্মিকতায় হাসি কান্না জুড়ে দিল। চিৎকার করে সে বলতে লাগল–

– এমন ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়া তুমি এমন করলা, ভাতের থালা ছুইড়া ফালাইলা, ওপর ওয়ালা সব দেখছে, সেই বিচার করব-- সেই বিচার করব।

এরই মধ্যে অদ্ভুত এক কান্ড। শুধু অদ্ভুত বলা বোধহয় ভুল হচ্ছে বরং অলৌকিক বলা ভাল। পলকের মধ্যে ঘরের পাটাতন ভেঙ্গে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ এক লোক রতনের কাঁধের কাছে এসে পড়ল। রতন বোকা বনে গেল। তার মাথায় শুধু একটা চিন্তাই খেলল ওপর ওয়ালার কোন দুত কি সত্যি সত্যি বিচারের জন্য হাজির।

ক্ষণকাল বিলম্ব না করে রতন তেল চিটচিটে লোকটার পা ধরে ফেলল।

– বাবাগো, সতী নারীর কথা যে এত দ্রুত আল্লায় কবুল করে তা বুঝি নাই। ক্ষমা কইরা দেন আমারে।

ততক্ষনে দুত মশাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ঘটনার প্যাঁচ বুঝতে তার বাকী রইলনা। মুখে গম্ভীর ভাব এনে বললেন,

– স্ত্রীর কথা মান্য করে চলবা। বড় বুদ্ধিমতি মেয়ে সে।

এরপর দ্রুত প্রস্থান করলেন।

যারা গল্পটুকু পড়লেন তারা হয়তো দুত মশাইয়ের পরিচয়টা ঠিকই ধরতে পেরেছেন। হাসিও খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিল যে লোকটা নেহায়েত চোর। হয়তো চুরি করার উদ্দেশ্যে পাটাতনে ঘাপটি মেরে ছিল। (হাসি চিৎকার করে ওপর ওয়ালা সব দেখেছে বলাতে লোকটি মনে করল বউটা তাকে দেখে ফেলেছে, আর তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে আড়াল করতে গেলেই এই অদ্ভুত কান্ডটি ঘটে। পাটাতনটিও নিশ্চই অনেকদিনের পুরনো এবং নড়বড়ে ছিল।) কিন্তু রতন তা ধরতে পারেনি। প্রথমে তাকে আমরা সরল ভেবেছিলাম। কিন্তু সে যে এত বোকা তা আমরা কল্পনাও করিনি।

ঘটনার দুদিন পর রতন যখন কদম এর কাছে "তে-পিয়াজীর রহস্য" শুনল তখন সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে নির্দোষ স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করাতেই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কোন দুত তাকে সাবধানবাণী দিতে এসেছিল। হাসি বুদ্ধিমতি মেয়ে। স্বামীর এ ভুলটা সে কখনও ভাঙ্গাতে যায়নি, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে যে এত চট্‌তে পারে তার এমন শিক্ষা হওয়াই উচিৎ। তবে তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আমি হলফ করে বলতে পারি---

– রতনের রাগ করার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ অভিনয় যা হাসি পরবর্তীতে কখনও জানেনি।

সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে ব্যাবিলন

এম.এম. তোফাজ্জল হোসেন
ফ্যাক্টরী ম্যানেজার, অবনী ফ্যাশন্স লিঃ

দিনটি ছিল ২০শে মার্চ ২০০৭। যথারীতি এমদাদ স্যার সকালে অবনী ফ্যাশনে আসেন। রুটিন কাজ সেরে যাবার সময় হঠাৎ তিনি বলেন, 'এবার আমি আসি। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আগামী চারদিন কিন্তু আপনাদের সংগে দেখা হচ্ছে না। সবাই ভালো থাকবেন।' আমি বললাম, 'স্যার কি কোথাও যাচ্ছেন ?' উত্তরে স্যার বললেন, 'হ্যাঁ তোফাজ্জল, হংকং যাচ্ছি বায়ার TESCO - এর নিমন্ত্রনে'। আমি বললাম, 'আগে বাইরে গেলে আসার সময় আমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। এবার কি আনবেন স্যার?' জবাবে এমদাদ স্যার বললেন, 'ব্যাবিলন সংসার এখন এত বড় হয়েছে যে একটা করে চকলেট আনতে গেলেও একটা ভারী ব্যাগ হয়ে যাবে।'

স্যারের ঐ জবাবে আমি সাময়িক ভাবে হতাশ হই। তবে স্যার কিন্তু আমাদেরকে হতাশ করেননি। হংকং থেকে তিনি আমাদের সবার জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা জগতের সব চকলেটের বিপরীতেও পরিমাপ যোগ্য নয়।

হংকং থেকে ফেরার পর যে দিন স্যার প্রথম অবনী ফ্যাশনে আসেন, সেদিনই তিনি আমাদেরকে তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। যুক্তরাজ্যের বিশ্ব বিখ্যাত কোম্পানী TESCO এবার তার সব মূল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারকদেরকে হংকং এ দুই দিন ব্যাপী SEMINAR – এ ডেকেছিল বেচা কিনি আলাপ করতে নয়। বরং তারা ডেকেছে সবাইকে পরিবেশ দুষণ ও পরিবেশকে দুষণ মুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেতন করবার জন্য। ঐ সেমিনারে তারা বলেছে ক্ষয়িষ্ণু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অপঃব্যবহারের কথা। নির্বিচারে বন-জংগল ধ্বংস করা এবং কলকারখানার ও যানবাহনে প্রাণ-সঞ্চারনের জন্য ঢালাও ভাবে জ্বালানী তেল – কয়লা পুড়িয়ে পরিবেশে বিষাক্ত কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধির কথা।

TESCO একদিকে যেমন তার সরবরাহকারীদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণে ও বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের বিস্তারে সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছে – অন্যদিকে এব্যাপারে TESCO নিজে কি করছে তার বিবরণ দিয়েছে সবিস্তারে। তার দু একটি উদাহরণ হলো – TESCO তাদের STORE গুলোতে এমন ব্যবস্থা রেখেছে যে কোন ক্রেতা যদি শপিং এ তার পুরানো শপিং ব্যাগটি সাথে নিয়ে আসে পূনঃ ব্যবহারের জন্য তাহলে সেই ক্রেতা TESCO এর কাছ থেকে শতকরা ৫ ভাগ মূল্যহ্রাস সুবিধা ভোগ করবে। এই ব্যবস্থার ফলে TESCO তার শপিং ব্যাগের প্রয়োজন প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। এতে পরিবেশের লাভ কি হয়েছে ? অনেক লাভ হয়েছে। আগের তুলনায় সমান প্রয়োজনে এখন অর্ধেক সংখ্যক ব্যাগ তৈরী করতে হচ্ছে বলে কাঁচামাল লাগছে অর্ধেক। ব্যাগ প্রস্তুতকারক কারখানায় জ্বালানীও লাগছে অর্ধেক। কাজেই একদিকে যেমন কাঁচামাল সম্পদের সশ্রয় হচ্ছে – অন্যদিকে কারখানা কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গত করছে কম। আর অপদ্রব্য (waste) পরিবেশে ছাড়ছে কম।

এমদাদ স্যার তাঁর সেমিনার থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা অবনী ফ্যাশনের সকল ম্যানেজার ও WPC (Workers' Participatory Committee) এর সকল সদস্যের কাছে বর্ণনা করেন এবং সবাইকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরিবেশ দুষণ, অপচয় বিষয়ে সচেতন থাকার ও এ বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন বিজলী বাতি, পাখা, জ্বালানি গ্যাস ও পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হলে তা যেমন একদিকে দেশের সম্পদের অপচয় রোধ করবে অন্যদিকে এই সব সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের বহুল ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

স্যারের পরামর্শ মনে রেখে আজ ব্যাবিলন কথকতার মাধ্যমে এর সকল পাঠক-পাঠিকার প্রতি বিশেষ আহবান জানাচ্ছি তারা যাতে আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশের কথা ভেবে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে, তাদের জন্য একটি সমৃদ্ধ, দুষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে পূর্ব বর্ণিত করণীয়গুলি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

প্রতিদিনের রোজ নামচা

মুহাম্মদ সাইফুল হক
ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজিং এন্ড মার্কেটিং

আমার জন্ম ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪। কেবল আপনাকে চুপিচুপি বলি ওটা কিন্তু আমার সত্যিকারের জন্ম তারিখ নয়। সরকারি চাকুরির একটি শর্ত নিশ্চিত করতে বয়স কমানোর এক সাধারণ চালাকি মাত্র। কাউকে বলে দেবেন না যেন ! প্লিজ ! যাহোক আমার সরকারি চাকুরি হয়নি, সত্যি কথা বলতে কি সেটার জন্য নিজ থেকে তেমন কোন কসরতও ছিল না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে যখন পেশাজীবি হওয়ার তাগিদ এসে পড়ল তখন অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন এগিয়ে এল ব্যাবিলন।

ব্যাবিলনের বেবী হিসেবে পেশাজীবনের সূচনা হল ১৯৯৯ সালের ১লা জুন। সেই থেকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমার কাছে মূল্যবান, আসলে মহা মূল্যবান। প্রতিদিনের ঘন্টাগুলোকে ভাগ করছি কয়েকটি অংশে। একাংশের ৬-৭টি ঘন্টা নিঃশেষিত হয় ঘুমে তথা দেহের তুষ্টিতে, কেটে যায় রাত ১২টা থেকে সকাল ৭টা অব্দি সময়। এরই মাঝে সুবহেসাদিকের অন্তঃত আধেকটা ঘন্টা বরাদ্দ আছে সৃষ্টিকর্তার স্মরণে। মনের তুষ্টিতে বরাদ্দকৃত ঘন্টাটি (সকাল ৭টা-৮টা) আজকাল যেনতেন ভাবেই কেটে যায় সবচেয়ে কাছের মানুষের পেশাগত কর্মতৎপরতার বাস্তবতায়। এরপর সময় যেন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা, এগারটি ঘন্টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাটে পেশামাতার সেবায়। দিনের এই শ্রেয় এগারটি ঘন্টাকে কিভাবে শ্রেয়তর করা যায় তা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারিনি। দিনের শ্রেষ্ঠ সময় যেখানে কাটছে, যাদের সাথে কাটছে এবং যাদের জন্য কাটছে তাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ের চেষ্টা আমি বরাবর করেছি এবং এখনও করছি কিন্তু কেন জানিনা আশ্বস্ত হতে পারিনি যে আমি সফল হয়েছি। আপনারা যারা সফল হয়েছেন দয়া করে বলবেন কি, কিভাবে হলেন ? আসলে আমি মনে করি সফল আমাকে হতেই হবে এবং হবও কিন্তু আপনারা সাহায্য করলে একটু আগে হব, সময় বাঁচবে। আমি কিন্তু বলছি সমন্বয়ের কথা কারণ আলাদা করে আমি বলতেই পারি আমার প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আমার অত্যন্ত গর্ববোধ হয়। আমার সহকর্মীদের মত এমন দায়িত্বশীল ও বন্ধুসুলভ মানুষ আমি কম দেখেছি আর আমার পরিবার সেতো আমার সুখের কেন্দ্রবিন্দু।

ছাত্রজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কল্পিত পেশার ধরন ছিল বিভিন্ন কিন্তু কমিটমেন্ট ছিল এক, অভিন্ন আর তা হল নিজের, পরিবারের ও মানুষের কল্যাণে নিরন্তর সৎ প্রচেষ্টা। আজ অবধি সেই কমিটমেন্টের কোন ব্যত্যয় হয়নি এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও তা অটুট থাকবে। আমার পেশার ধরনের কারনে কর্মঘন্টাকে নির্দিষ্ট সময়ের ছঁকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। সত্যিকথা বলতে এটি আমার কাম্যও নয়। সে যাহোক ফিরে আসি যা লিখতে চেয়েছিলাম সে বিষয়ে। সন্ধ্যা ৭টায় ঘরে ফেরা, ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন - আমার স্ত্রী-কন্যা আমার শান্তির আধার, ঘরে ফেরার আকর্ষণ। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১২টা, এই পাঁচটি ঘন্টা নিয়ে আমার পরিকল্পনার শেষ নেই কিন্তু পরিকল্পনার পরিকে বাস্তবে না পাওয়ায় সেটি যেন প্রায়শ কল্পনা বিলাসেই পরিণত হয়। তারপরও যা প্রতি সন্ধ্যার করনীয়ের তালিকায় থাকে তা হল টিভির পর্দায় খবর দেখা, পত্রিকার পাতায় চোখ বুলানো এবং স্ত্রী-কণ্যার সাথে খুনসুটি।

টিভির পর্দার সেরা আকর্ষণ দেশের রাজনীতি। বিশ্বাস করুন আমার পৌনে তিন বছরের মেয়ে আদৃতা এদেশের রাজনীতির দুই পরাশক্তি বেগম খালেদা ও শেখ হাসিনাকে টিভির পর্দায় দেখলেই চরমানন্দে আমাকে দেখিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে ডঃ ইউনুসকে দেখলেই আমাকে দেখিয়ে দিত কিন্তু আজকাল আর ডঃ ইউনুসকে তেমন দেখাতে পারে

না। এমনকি ডঃ ফখরুদ্দিনকেও কালেভদ্রেই যেন দেখা যায়। আমি আসলে ভাবি আমার সন্তান ডঃ ইউনুস, ফখরুদ্দীনকে দেখে বেশী উচ্ছ্বসিত হোক কিন্তু যা চাই তাই কি হয়। মনটি একটু খারাপ হয়। আর খুনসুটির জন্য মনের যে শান্ত ভাবটি প্রয়োজন তা আজকাল অনেকটা দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য আমি নিজে যতটুকু দায়ী তার পুরোটুকু না হলেও অন্তঃত তার কিছুটা দায়তো দিতেই পারি আমার পারিপার্শ্বিকতাকে; কিন্তু তা আমি দেবনা। কারণ কঠিন পারিপার্শ্বিকতা আমাকে সংগ্রামী ও যোগ্যতরও করে তুলেছে। আর সেই কারণে আমি নিজেও পেশাগত দক্ষতা ও অর্জন বাড়াতে এই পাঁচটি ঘন্টাকে বিশেষভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছি অন্তঃত বছরখানেক হল। আমি খুব উদ্দীপ্ত হই, ভাল লাগে, যখন দেখি ৩৫-৪৫ কিংবা তদুর্ধ্ব বয়সের পেশাজীবিরা দলবেধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, Presentation করছে, Assignment লিখছে, Brainstorming করছে, সুন্দর নেটওয়ার্কিং করছে ইত্যাদি- তখন মনে হয় আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেশবাসী এর সুফল পাব। যখন ভাবি আমার সন্তান আমার চেয়েও একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল পৃথিবী দেখবে তখন খুব ভাল লাগে। আবার এটাও ঠিক যে, প্রতিদিন মনে হয় আগামী দিনটি যাতে আরও ভাল কাটে আজকের অভিজ্ঞতার আলোকে কিন্তু সেটি যেন হবার নয়। এ যেন সেই চক্রের মত, ভাল করে পড় মা, তাহলে সুখী হবে, পড়া শেষ হলে বলে, একটু কষ্ট কর মা চাকুরী হলেই সুখী হবে, চাকরী হলে বলে, বিয়ের পর সুখ, বিয়ের পর বাচ্চা হলে, বাচ্চা হলে তাদের মানুষ করলে, কিন্তু সুখ যেন সোনার হরিণ। আমার প্রতিটি দিনের ২৪টি ঘন্টা যেন সেই চক্রেই বাঁধা। আপনারটি ?

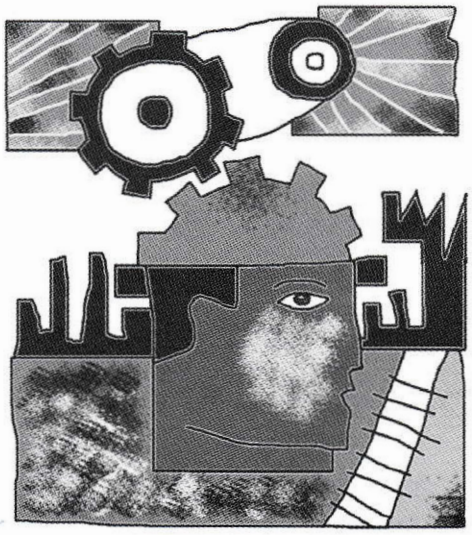

এইটা আবার কোন তেল ?

মোঃ রাকিবুল ইসলাম
সুপারভাইজার প্রডাকশন, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ

- এই তো স্যার আপনার মহত্ত্ব, আপনি যে কি জিনিষ, আপনি নিজেই জানেন না, স্যার।
- জিনিষ মানে ?
- না মানে স্যার; আপনি যে কত যোগ্য একজন বস তাই বলছি আর কি ? জীবনে কত বসই তো দেখলাম স্যার একটু তেল দিলেই সবাই এক্কেবারে বরফের মতো গলে যায়। একমাত্র আপনাকেই দেখলাম, যাকে তেল দিয়ে কাজ হয় না।
- তা আপনি ঠিকই ধরেছেন, তেল দিয়ে আমার কাছ থেকে কেউ কোন সুবিধা আদায় করতে পারে না। হেঃ হেঃ হেঃ!
- কিভাবে পারবে স্যার, আপনি তো আর যেই সেই বস না। আপনার মত জ্ঞানী, স্মার্ট বস আর কজন হয়?
- সত্যি বলছেন ? তা কি দেখে আপনার এমন মনে হল ?
- সে তো স্যার প্রথম দিন আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। আপনার টক টকে লাল রঙ্গের টাই দেখেই বুঝেছিলাম, গোবরে পদ্ম ফুল ফুটেছে।
- হোয়াট ?
- না মানে স্যার, আমাদের এই গোবরের মত অফিসে আপনার মত পদ্মফুলের আগমন এটাই বলছি আর কি।
- আপনি বাড়িয়ে বলছেন।
- কি যে বলেন স্যার, আপনি তো অফিসে আসা মাত্রই শক্ত হাতে সব টাইট দিয়ে ফেলেছেন। এমন দক্ষ অফিসার পাওয়া কি সোজা কথা ?
- তাই বুঝি?
- নয় তো কি ? ঐ দিন যে গাড়ী স্টার্ট দিতে দেরী হওয়ায় আপনি গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারের গালে কষে একটা চড় লাগালেন আর ওর মুখ থেকে চুইংগাম ছিটকে গিয়ে আপনার চুলে আটকাল।
- আপনি দেখে ফেলেছেন ?
- না মানে স্যার দেখিনি। আমি দেখব কেন স্যার! ছিঃ ছিঃ স্যার কি যে বলেন! তবে আপনার সেই চড় কিন্তু টনিকের মত কাজ করেছে। বেচারা তো এখন আর গাড়ি স্টার্ট বন্ধই করে না।
- আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ! এবারে বলেন, আমার রুমে কেন এসেছেন ?
- স্যার, আপনার মত এমন বিচক্ষন, বুদ্ধিদীপ্ত লোককে আর কি বলব ?
- (মনে মনে, আমি বিচক্ষন বুদ্ধিদীপ্ত ! তয় গেদার মায় আমারে গোবরধন কয় কেন ?) না ভাই আপনি অযথাই প্রশংসা করছেন।
- একদম না স্যার, বরং কমিয়েই বলছি। তবে ছোট খাট একটা সমস্যা আছে বৈকি ! ও তেমন কিছু না স্যার।
- আরে ব্যাপার কি বলেন তো শুনি।
- না মানে স্যার, সমস্যা হয়েছে কি, ছোট বোনের ছেলেটা বায়না ধরেছে হাফপ্যান্ট পরে কক্সবাজারে একটা সাঁতার দেবে। বাপ মরা ছেলে স্যার; আমার কাছেই বড় হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০ টাকা দিয়ে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড হাফ প্যান্ট কিনেও ফেলেছি স্যার।
- তো এখন কি ছুটি চাই ?
- সাধে কি আর আপনাকে জ্ঞানী বলি স্যার ! তা ছুটি নিতেও মন চায়না কারন ছুটিতে গেলেতো স্যার আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু আবার ওই যে বোনের ছেলেটা.....।
- কি যে বলেন এই সব। যান যান, আপনি ঘুরে আসুন।
- আপনি কত মহান হৃদয়ের স্যার, ভাবতেই অবাক লাগে।
- তো ছুটি কয়দিনের লাগবে ?

- আমার তো স্যার আগে পরের অভিজ্ঞতা নাই। তবে আপনার মত জ্ঞানী মানুষ স্যার ঠিকই বুঝবেন। তা আমার মনে হয় দিন সাতেক হলে যেয়ে এসে অফিস করতে পারব।
- আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে সাত দিনেরই ছুটি দিলাম বেড়িয়ে আসেন।
- স্যার, একটা কথা বলতে খুব লজ্জা লাগছে। মাসের শেষ, হাতে একদম টাকা পয়সা নেই। আপনার মত এত বড় ব্যক্তিকে এত ক্ষুদ্র কথা কিভাবে যে বলি ?
- আহা ! কি যে বলেন। আমি এক্ষুনি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি, আপনি আগামী মাসের বেতন এ্যাডভান্স নিয়ে যান।
- আহা ! ধন্য ধন্য ! স্যার একটু পায়ের ধূলা দিন।
- আরে আরে, কি করেন। জুতা খুলে ফেলবেন নাকি ?
- স্যার, আজকে জুতার কারনে আপনার পায়ের ধূলা পেলাম না কিন্তু আপনার জুতার ধূলা তো পেলাম। এই আমার জন্য অনেক। তাহলে স্যার আসি। কিন্তু আপনার রুম থেকে তো স্যার বেরোতেই ইচ্ছা করছে না।
- এসি চলছে তো, এই জন্য বোধ হয়।
- না স্যার, কি যে বলেন ! আপনার জন্য বেরোতে ইচ্ছা করছে না। আপনার মত এমন জ্ঞানী, হৃদয়বান লোকের সামনে বসে থাকাও ভাগ্যের ব্যাপার। অফিসের লোকজন এসে যে আপনাকে তেল দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেবে, এমন সাধ্য কার ? আপনার মত এমন বসই তো আমাদের অফিসের জন্য দরকার ছিল স্যার।
- তা আপনি অবশ্য যথার্থই বলেছেন। তেল দিয়ে কেউ কোনদিন আমার কাছে থেকে সুবিধা আদায় করতে পারবে না। হেঃ.....হেঃ.....হেঃ.....।

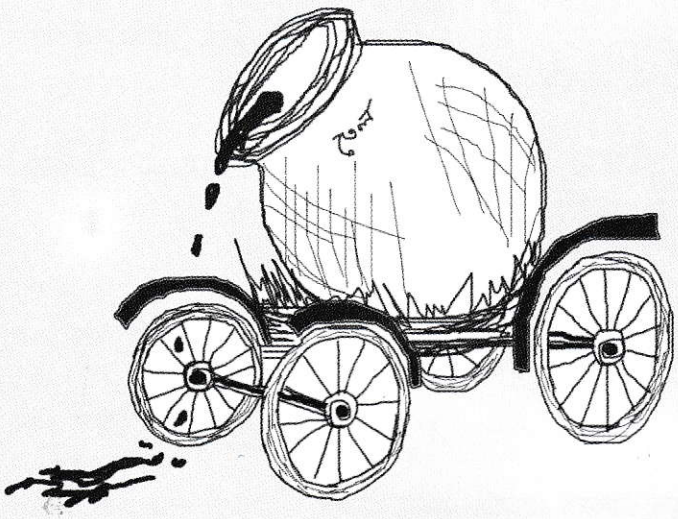

বিশ্বজুড়ে অনেক দেশের
পোষাক বানায় যারা
ঈদের দিনে তাদের দেখি
নতুন কাপড় ছাড়া।

প্রয়োজন আত্ম শুদ্ধির

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জুনিঃ অফিসার, আই.টি, বি.জি.এল.

ব্যবসায়ী ঘরের বহু প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ জগতের কত উপকার করে গিয়েছেন। দেশীয় বা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ ব্যবসায়ীর পরিশ্রম ও বুদ্ধি কৌশল।

মিস্ত্রীর ছেলে জেমস্ ওয়াট এর আবিষ্কারের ফলে জগতের কত উপকার হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতা তার কাছে কত ঋণী। জ্বাল দিলে পানি থেকে যে বাষ্প ওঠে সে বাষ্পের যে কত শক্তি আছে তা কে জানতো? হাজার ঘোড়ার শক্তিতে যা না হয়, বাষ্পের কল্যাণে তা হয়। ওয়াট যদি মানুষকে এ কথা বলে না দিতেন তা হলে পৃথিবীর সভ্যতা এত দ্রুত এগিয়ে যেত না। আজ সভ্য পৃথিবী কি তার কথা মনে করে? ওয়াটের বাষ্প শক্তি আবিষ্কারের ফলে আর্কারাইড সুতা প্রস্তুত করার উন্নত ধরণের কল প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। আর্কারাইড কোন বড় ঘরের ছেলে ছিলেন না। বাবার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। তের ছেলের মধ্যে আর্কারাইড ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ। কোন কালেই তার স্কুলে যাবার ভাগ্য হয়নি। নিজে নিজেই যা একটু পড়েছিলেন।

প্রথমে বাবা তাকে এক নাপিতের কারখানায় পাঠান। কাজ শেখা হলে আর্কারাইড নিজে একটা দোকান খুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা লাগাবার ব্যবস্থা শুরু করলেন। শহরে শহরে, মেলায় মেলায় ঘুরে তিনি চুল কিনে বেড়াতেন। এই ব্যবসা টেকসই হয়নি। বিপন্ন হয়ে আর্কারাইড ভাবলেন একটি সুতা তৈরী করার উন্নত ও ভাল যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় কি ভাবে। তার পর রাত দিন ভাবতে লাগলেন। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। স্ত্রী, স্বামীর এই মাথা পাগলামী সহ্য করতে না পেরে একদিন যত যন্ত্রপাতি ছিল, সব ভেঙে চুরে বাইরে ফেলে দিলেন। আর্কারাইড এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন-ফলে, স্বামী স্ত্রীতে চির বিচ্ছেদ হয়ে যায়। গায়ে জামা নাই, পরনে জুতা নাই-ছিড়ে গিয়েছে-কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। একমনে ভাবতে লাগলেন কি করে উন্নত প্রণালীতে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে সুতা তৈরী করার যন্ত্র আবিষ্কার করা যায়।

লেখা পড়া জানা না থাকলেও অধ্যবসায়ী, চিন্তাশীল, দৃষ্টি সম্পন্ন, উদ্ভাবনী শক্তি ও ঐকান্তিক সাধনার কাছে কিছুই আটকে থাকে না। আর্কারাইডের সাধনাও ব্যর্থ হল না। জগৎ সভ্যতার প্রধান ভিত্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন।এই আবিষ্কারের পর আর্কারাইড বড় বড় সুতার কারখানা স্থাপন করলেন। এ সব কারখানার কাজে তাকে সকাল হতে রাত ন'টা পর্যন্ত অনবরত খাটতে হতো।

যখন তার বয়স পঞ্চাশ, তখন তিনি ইংরেজী ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করলেন। কারণ শুদ্ধ করে তখনও তার দুই লাইন লেখার ক্ষমতা ছিলনা। সম্পদ ও গৌরব তার লাভ হল। মানুষের কল্যাণে তৈরী করলেন বাষ্প ইঞ্জিনের সুতা তৈরীর যন্ত্র যার সুবাদে সভ্য পৃথিবীতে তৈরী হল আমাদের সব সু-প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস শিল্প। আবৃত করলাম আমাদের দেহখানা রং বে-রঙের পোশাকে। আর্কারাইড এ কথা ভালো ভাবেই জানতেন তার বাবার মত তাকেও একদিন পৃথিবী ছাড়তে হবে। গায়ে জামা পরার সময় হয়তোবা এ জামার সুতা নিয়ে কেউ ভাববেই না।

পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে নিজেকে দেখার একটা প্রবণতা থাকে। তা না হলে একুশের বই মেলায় সবগুলো বই বিক্রি হয়ে গেলেও যে, নিজের কোন লাভ নেই সে ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ ১৪০০ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন। তার পরেও তিনি এত কিছু রচনা করেছিলেন। কেন?

নজরুলের গান দিয়ে ঈদ শুরু হলেও এ দিনে কেউ তার মাজারের দিকে না গিয়ে বরং ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। বিদ্যুতের আবিষ্কারক ভোল্টার এর বিয়ের দিনে তাঁর জন্য কেউ নিয়ন বাতি জ্বালায় নি। সক্রেটিসের যুক্তি নিয়ে কেউ তার পক্ষে আদালতে দাঁড়ায় নি।

তার পরেও এদের কেউ সুন্দর ধরনী গড়তে নিজের হাত গুটিয়ে রাখেনি। কারণ তাদের ভাল করেই জানা ছিল 'দুধ দিবে গাভী কিন্তু খাবে বিড়াল' এটাই প্রকৃতি পছন্দ করে।

মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে আসে এবং প্রয়োজন শেষে চলে যায়। তা হলে মানুষের আসার কি দরকার ছিল? হ্যাঁ ছিল একটা--- আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যে মানব বন্ধন, প্রতিটি মানুষই যে, তার স্বজন। তাহলে তাঁর কাজ কি?
কোন কাজ নেই, কাজ একটাই - 'আত্ম শুদ্ধি'।

অনুভূতির উপলব্ধি

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচ.আর.ডি.

১৯৭১ সাল। চারিদিকে ভয়, মৃত্যু, হাহাকার- যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশ জুড়ে। এরই মধ্যে এক সংগ্রামী যোদ্ধা বাড়িতে নববধু ও তার অনাগত ভবিষ্যতকে একলা ফেলেই বেরিয়ে পড়েছে দেশের জন্য মুক্তি আনতে। যুদ্ধের তান্ডব লীলার মধ্যেই জন্ম নিল এক ফুটফুটে শিশু। নব পরিনীতা হয়ে গেলো পরিপূর্ণ মা। মুক্তিযোদ্ধা বাবা জানেও না তার সন্তানের জন্মের খবর। এবার যুদ্ধ শুরু হল এক মায়ের তার সন্তানকে বাঁচানোর, অপেক্ষা তার সহধর্মীর ফিরে আসবার। মুক্তিযোদ্ধার পরিবার হবার কারনে কম গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়নি। এমনকি ছয় মাসের শিশুপুত্রকে নিয়ে আটকে পর্যন্ত রাখল পাক বাহিনী। কিন্তু বিধাতা ছাড়া আর কার সাধ্য আছে মায়ের বুক খালি করবার!

এসবই আমার মায়ের মুখে শোনা। তাই বলে পাঠকবৃন্দ ভাববেন না এটা কোন গল্পের শুরু। যা হোক রাতের অন্ধকার কেটে একসময় ভোর হয়। ভোরের ঝলমলে আলোয় আবার জীবন শুরু হল । দুঃখ কষ্ট, হাসি আনন্দ, জীবনের নানা টানা পোড়েন, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সেই ছোট শিশুটি হল আজকের জাহাঙ্গীর আলম (জয়)।

ভূমিকাটা একটু বড় হয়ে গেল। আগে কখনও ভাবতেই পারিনি আমার আমিকে কোনদিন এইভাবে উপস্থাপন করতে পারব। কারণ গল্প কবিতা তো দুরের কথা, পরীক্ষার উত্তর পত্র ছাড়া কাউকে কোন দিন চিঠি লিখেছি কিনা তাও মনে পড়ে না। জীবন একটা খেয়ালেই চলে যাচ্ছিল। ভাল কি মন্দ জানি না। তবে ব্যাবিলন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এখন আমি উপলব্ধি করতে পারি আজ থেকে আট বছর আগের কথা। আমার জীবনটা যেন একটা ছাঁচ থেকে আরেকটা ছাঁচে এসে পড়ল। আজ এই দুচার লাইন যা লিখতে পারছি তা এই ব্যাবিলনের কল্যাণেই বলতে হয়।ব্যাবিলন ম্যাগাজিনের এটা দ্বিতীয় সংখ্যা। আজকে এই লেখা লিখতে গিয়ে একজনের কথা খুব বেশি মনে পড়ছে। প্রথম সংখ্যাটা বেরোনোর সময় যে মানুষটা ব্যাবিলন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে যেয়ে যেয়ে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চেয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে কিছু না কিছু লিখবার জন্য। আজ বলতে দ্বিধা হচ্ছেনা, তখন তাকে নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেও ছাড়িনি। কাজের চাপে, আমার এই পরিচিত পরিধিতে একে একটা খেলাই মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু যত যাই ভেবে থাকি বা বলে থাকি ম্যাগাজিন প্রকাশের শুভ কামনায় কোন ঘাটতি ছিলনা। এই সংখ্যার জন্য যে কিছু লিখব এমন চিন্তাও কখনও করিনি। কদিন আগে, এক মিটিং এ এমদাদুল ইসলাম স্যার সবাইকে ম্যাগাজিনে লিখার জন্য এত আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছিলেন, তখন হঠাৎ করেই মনে হল, কাব্য রচনা তো আমার দ্বারা সম্ভব না একটু চেষ্টা করে দেখিনা কিছু লিখতে পারি কিনা। এই লেখার কল্যাণে যে কতকিছু ভেবে ফেললাম, কত আইডিয়া মাথায় ঘুরাঘুরি করে আবার নিঃশব্দে বিদায় নিল। কাগজে কলমে সেসব প্রকাশের ক্ষমতার কাছে আবার হার মানলাম। এই প্রথম সত্যিকারভাবে অনুভব করলাম আমরা নিজের কাছেই কত অসহায়।

সব আশা যখন ছেড়েই দিয়েছি তখন হঠাৎ করেই মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভাবলাম নিজের কথাই কিছু লিখে ফেলিনা কেন। এটা তো পারা সম্ভব। তার প্রতিফলন পাঠকবৃন্দ আপনারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। যদিও আমি এখনও জানি না ম্যাগাজিন কমিটি আমার এই লেখা ছাপাবার যোগ্য মনে করবে কিনা, এই লেখা আদৌ ম্যাগাজিনে স্থান পাবে কিনা! কমিটির সিদ্ধান্ত যাই হোক তাতে আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

পরিশেষে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা, অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে শেষ করছি। আসলে এই কথা গুলো লিখবার জন্যই আমি কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলাম। আজ জীবনের এই পর্যায়ে এসে যখন পিছন ফিরে তাকাই, দেখি মানুষ কত বদলায়।

এই আমি তার প্রমাণ। তবে পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্রটা খুব জরুরী। সীমাবদ্ধ গন্ডিতে থেকে যা কোন দিনই সম্ভব নয়।

ব্যাবিলন আমার জীবনটাই বদলে দিল। এখানে না আসলে জীবনের এত রূপ থাকে কখনো জানাই হতনা। এখন একটা কথা খুব মনে হয়, মনে হয় একটা মানুষ জন্মায়, দীর্ঘ সময় পার করে, আবার চলেও যায়। এই দীর্ঘ সময়ে হয়তো সে তার নিজেকেই জেনে যেতে পারেনা।

আমার এইসব উপলব্ধি, এই আমি যে একটু একটু করে আজকের আমি হয়ে উঠেছি তার সবটুকু কৃতিত্বই ব্যাবিলনের। ব্যাবিলনই আমার আমিকে চিনিয়েছে। এর জন্য ব্যাবিলনের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। এই বাক্যটা বলবার জন্যই আমাকে এত ভুমিকা, এত উপমা টানতে হল। যেভাবেই হোক এই যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পেরেছি এতেই আমি পরিতৃপ্ত। "ব্যাবিলন কথকতা" না হলে এই সুযোগ আমার কোন দিনই হতোনা। তাই "ব্যাবিলন কথকতা" তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর প্রাণঢালা ভালবাসা এই সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

"ব্যাবিলন কথকতা" তোমার চলার পথ অনেক অনেক দীর্ঘ হোক যাতে করে পথের শেষে তুমি কোনদিনই পৌঁছাতে না পার। তুমি চলতেই থাকবে আমাদের মত সাধারনের জন্য।

কি রাগিনী বাজালে হৃদয়ে

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন, ব্যাবিলন গ্রুপ

অনেকটা আশ্রিতার মতই ও এসেছিল আমাদের বাসায়। বেশ ক বছর আগের কথা সেটা। একদম কচি বয়স। আমার অবশ্য এ সব লক্ষ্য করার সময় ও রুচি কোনটাই নেই। নিজের জগতের বাইরে কোথায় কি হচ্ছে খুব কমই হিসেব রাখি তার। বাড়ীতে কে এলো, কে গেল, কে রইলো এগুলোর হদিস আমার জানা থাকে না।

বেশ মনে আছে অনেক দিন পর্যন্ত ওকে ভাল করে দেখিইনি। আমার স্ত্রী ও কন্যাদের খেয়াল ও কৃপা ধন্য হয়ে আমাদের বাড়ীতে ওর আশ্রয়। কন্যাদের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর এই আদিখ্যেতায় আমি অবাক না হয়ে পারি না। বিরক্তও হই বেশ। হুট করে রাস্তা থেকে এমনি করে কাউকে ধরে আনে কেউ?

মনে নেই কতদিন – তা বোধ হয় অনেকদিন পরেই হবে যে ওকে কিছুটা কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখেছি। দেখে অবশ্য খানিকটা অবাকই হয়েছি। বেশতো দেখতে। গায়ের রঙ বিলিতি মেমদেরকেও হার মানায়। ধব ধবে ফরসা যাকে বলে। দু চোখের দৃষ্টিতে অনেক মায়া। আমার অবশ্য অত মায়া টায়া হয়না। চোখাচোখি হল, আবার চোখ সরিয়েও নিলাম। বলতে পারেন পরক্ষনেই ওর অস্তিত্ব ভুলে গেলাম।

তা বললেই কি অত সহজে অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়? বাস্তবে এক বাড়ীতে দিনের পর দিন থেকে তো আপনি ওর অস্তিত্বকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারবেন না। বাড়ীর সবার মাত্রাহীন আদর আহ্লাদ পেয়ে আমার অবহেলা উপেক্ষাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ও কিন্তু দিনে দিনে বেশ ডাগর হয়ে ওঠে। হঠাৎ যখন চোখ পড়ে–ভাবি, 'বাহ্ ! বেশ হয়েছেতো দেখতে' ঐ পর্যন্তই। আবার ও উপেক্ষিতাই রয়ে যায় আমার কাছে।

এর মধ্যে বেশ কটা বছর পার হয়েছে। এখন সে আমাদের বাড়ীর একজন গর্বিত স্থায়ী সদস্য। এমনিতেই ওকে আমি দেখতে পারিনা, পছন্দ করি না, তার মধ্যে আবার কি হয়েছে জানেন ? কণ্ঠে একটু গর্ব নিয়েই যেন আমার স্ত্রী বলেন ওর কিছু কিছু গুণপনার কথা। শুনেতো আমার আক্কেল গুড়ুম। আমিতো প্রীত হতে পারিনা। গর্বও আমার হয় না। বরং ওকে তখন আরো অসহ্য মনে হয়। বিশ্বাস হয় আপনাদের ওর সব পছন্দের খাবারই নাকি আমার পছন্দের তালিকা থেকে চুরি করা? আমি যা যা খেতে ভালবাসি ওরও নাকি ঠিক তাইই পছন্দ। আমার সহজ সরল গিন্নী যখন হাসতে হাসতে আমাকে ওর এই গুণের কথা বলেন তখন ওর এই ঔদ্ধত্যে ও বাড়াবাড়িতে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি স্পষ্ট টের পাই ওর প্রতি আমার অবহেলা – আদর – অনাদর – অবজ্ঞা এগুলো ও বেশ বুঝতে পারে। আমার কাছাকাছি খুব একটা আসে না তেমন। কিন্তু বুঝতে পারি দুর থেকে প্রায়ই আমাকে দেখে বেশ। আমি বাসা থেকে বেরুই যখন, চেয়ে থাকবে দুর থেকে। আবার বাসায় ফিরব যখন ও যেখানেই থাকুক দৌড়ে এসে একটা দুরত্ব রেখে দেখবে আমাকে। দৃষ্টিতে যেন নীরব ভাষা ঝরে – এত দেরি করে এলে!

আমি কিন্তু এতে গলি না। এ বাড়িতে এই আশ্রিতার এত আদর, এত অধিকার ফলাবার আতিশয্যটাকে আমি এখনো মেনে নিতে পারি না।

সন্দেহ নেই ও আকর্ষণীয়া। মুখে ভাষা নেই বটে, কিন্তু দুনয়নের শব্দহীন ভাষায় কত কথাই না সে বলে। আমার স্ত্রী ওর ঐ মৌণ ভাবের আদান প্রদানে বেশ অভ্যস্ত হয়েছেন। ও যে তাকে কি যাদুতেই না বশ করেছে! ওর প্রতি আমার স্ত্রী–কন্যাদের আচরণ দুর্বোধ্য। ওর প্রতি তাদের সীমাহীন দুর্বলতা আমার সমর্থন পায়না মোটেই।

এতক্ষনে আপনারা নিশ্চই ধরে ফেলেছেন আমি একটা অনুভুতিশুন্য নির্দয়, নিষ্ঠুর ও ভাবাবেগহীন পাষাণ হৃদয় মানুষ।

তা আপনাদের এই সিদ্ধান্তে আমার দ্বিমত নেই। অসত্যতো নয়। আর আমি যে নিজেকে খুব একটা আলাদা কিছু ভাবি তাও নয়।
জানেন, ইদানিং আরো কিছু নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে ওর? বাসার সদস্যরা সবাই যখন ওকে রেখে বাইরে কোথাও যায় (সব সময় তো আর ওকে সাথে নিয়ে যাওয়া যায় না), তখন খুব আলতো পায়ে চলে আসে আমার কাছে। আমি ড্রইং রুমে বা বেড রুমে যেখানেই থাকিনা কেন ও ঠিক চলে আসে। অবাক হই। সাহসতো বেশ বেড়েছে। আমার গা ঘেঁসে বসে আবার মাঝে মাঝে। আমি বিরক্ত হয়ে সরে বসি। মুখে কিছু বলিনা অবশ্য। তখন যদি ওর চাহনিটা দেখতেন। নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে ও কত যে অনুযোগ, কত যে অভিমান, কত যে কষ্ট ঝরায়। আমার তাতে তেমন ভাবান্তর হয় না। স্বীকার করি মানুষটা আমি একটু আলাদাই এবং কঠিন হৃদয়ও বটে। বুঝি আমার কাছ থেকে ও একটু আদর, একটু প্রশ্রয়, একটু সহানুভূতি পেতে চায়। কিন্তু আমি যেন এসব কিছুই বুঝতে পারি না – নির্বিকার থাকি।

এর মধ্যে একদিন ও অসুখে পড়ল। কি হয়েছে কে জানে! আমি হয়তো বুঝতামও না যদি না দেখতাম আমার বাসার সবাই বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওকে নিয়ে। খাওয়াবার জন্যে সাধাসাধি, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো – কত রকম ঝকঝকি সবার। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে একেবারেই। পানি ছাড়া কিছুই গলা দিয়ে নামানো যায় না। দুদিনেই যেন চেহারা থেকে ওর সব লাবণ্য মিলিয়ে যায়।

বুঝতেই পারছেন, আমার পাথর সম কঠিন হৃদয়ে এর কোন ছোঁয়া অনুভব করার কথা নয়। অবাক হবেন জানি, কারণ আমিও অবাক হয়েছি। কেমন যেন একটা অচেনা অনুভূতিতে আমার মনটা কিঞ্চিত চঞ্চল হয়েছে। একটা খারাপ লাগা ভাব যেন টের পাচ্ছি। আশ্চর্যতো! আমার চেতনার অন্তঃস্থল থেকে কে যেন বলেছে– 'যাও ওকে একটু স্পর্শ করো। আদর করে ওর সব কষ্ট, সব অভিমান ভুলিয়ে দাও'। কি জ্বালা! আবার সম্বিত ফিরে পাই আমি। নিজেকে তিরস্কার করি হঠাৎ চিত্ত বৈকল্যের জন্য। এই সাময়িক দুর্বলতার জন্য লজ্জা পেয়ে যাই নিজের কাছে। পড়ার ঘরে গিয়ে একটা বই খুলে বসি। নাহ্! বই ভালো লাগছেনা। উঠে পড়ি আমি। তারপর কোন এক অদৃশ্য সূতোর টানে যেন এগিয়ে যাই ওর শয্যার দিকে। আমার আগমন টের পেয়ে যায় ও। দুচোখ মেলে আমাকে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে। ভাবে হয়তো, একি বাস্তব না স্বপ্ন! মাথাটা এগিয়ে দেয়। গভীর আবেগে আমি হাত বুলিয়ে দেই ওর মাথায় ও পিঠে। আবেশে ওর চোখ বুজে আসে – চোখের কোন ভিজে আসে বোধ হয়। আমিও যেন হঠাৎ চোখে ঝাপসা দেখি।

দেখুনতো কি কান্ড! আমার বুকের ভেতরে যে রক্ত মাংসের একটা হৃৎপিন্ডের বসবাস তা যেন আমার জানাই ছিল না। ওর জন্য আজ তা আমার বোধে ও অস্তিত্বে ধরা পড়ায় আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। কৃতজ্ঞতা অনুভব করি ওর প্রতি।

এই টুকুই আমার গল্প। আর কি? ওহ্! বুঝেছি। ওকে আপনারা এখনো চিনতে পারেননি তাইতো ? টিনা। এটাই ওর নাম। আমার ছোট মেয়ের দেয়া। ঘরে পোষা এক মেয়ে কুকুরের জন্য নামটা খুব রোমান্টিক তাই না!

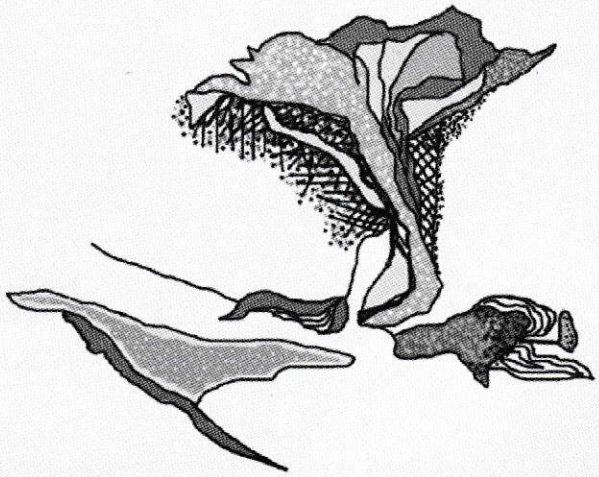

অপেক্ষা

আখতারুজ্জামান (সাগর)
কিউ.সি সুপারভাইজার, এ.কে.এল

স্বপ্নের স্বর্ণালী দিন গুলি
হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো,
বিষাক্ত কালিমায় চেপে ধরলো মনটাকে ।

অনাকাংখিত অজানা নেশায়
কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেললো হৃদয় টাকে ।
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে বাকরুদ্ধ কন্ঠস্বর
কি এমন ক্ষতি করেছিলাম ?

স্বপ্নীল নেশায় বিভোর ছিলে তুমি
আমার আর্তনাদ, তুমি বুঝেও বোঝনি,
হয়তো ভালোবেসেছিলাম, জীবনের চেয়েও বেশি,
কাংখিত স্বপ্নে বিভোর ছিলে তুমি
আর আমি ?

জীবন্ত লাশ হয়ে প্রহর গুণছি ।
ফিরে এসো, ফিরে এসো
নিষ্পাপ মন মন্দিরের দেবী।
অপেক্ষায় ..... ।

সুধীজন

মোঃ ফজলুল করীম
এসিঃ ম্যানেজার, কিউ.সি., বি.জি.এল

সুধীজনের বড়ই অভাব মোদের দেশে ভাই
সুধীজনের শাষন কায়েম আমরা সবাই চাই।

হিংসা, অন্যায়, সন্ত্রাসীতে সমাজ গেছে ভরে
দুর্নীতিবাজ, শোষণ কারীর দাপট যাচ্ছে বেড়ে।

বিপুল টাকার মোহে পড়ে ন্যায়-নীতি সব ভুলে
বাঘের মত গর্জন করে বুক ফুলিয়ে চলে।

উচিৎ কথা বললে তাদের চোখ পাকিয়ে চায়,
অন্যায় ভাবে ধমক দিয়ে গরীবদের ঠকায়।

অপরাধের কুয়াশাতে আকাশ যাচ্ছে ঢেকে
সুখ-শান্তি সব হারিয়ে যাচ্ছে এদেশ থেকে।

গরীব-ধনী কোন জনাই আইনের উর্ধ্বে নয়
মিথ্যা, অন্যায়, অবিচারের কভু হয়না জয়।

বাংলাদেশের হাল ধরেছে সুধীজনেরা ভাই
সুশীল সমাজ গড়বে তাঁরা শান্তি পাবে সবাই।

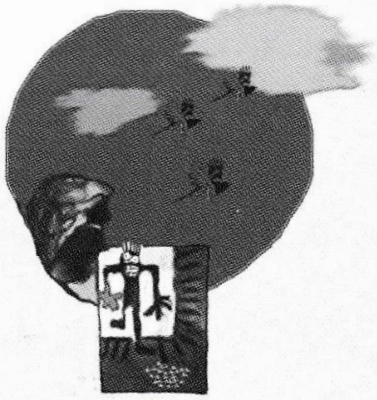

আমাদের কথা

মোঃ সাইদুল হক (মিতন)
অফিসার মার্চেন্ডাইজিং, অবনী নীটওয়্যার লিঃ

আমরা সবাই শ্রমিক দল,
বাহুবল মোদের সম্বল।।
রাখতে হবে অবদান।
করতে হবে অর্জন।
এই হল মোদের পণ।।

দিনে এসে রাতে যাই,
ভয় নাই ভয় নাই।
আছে মোদের প্রিয়জন
এ সব-ই যেন অর্জন।

হাত দিয়ে কাজ করি
মেধা দিয়ে বিচার করি,
নতুনের সন্ধানে –
অজানাতে খুঁজে ফিরি।

সুখ মোদের কাজে
আনন্দ মোদের সাফল্যে,
স্বপ্ন দেখি–
ভরসা মোদের সাথে।

দিন শেষে ঘরে ফিরি
প্রিয়জনের মুখ দেখি
ভুলে যাই ক্লান্তি–
আসে মনে শান্তি।

আমরা সবাই শ্রমিক দল।
আমরাই দেশের সম্বল।

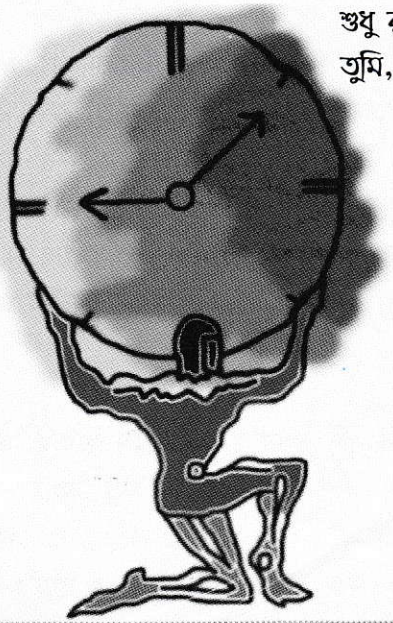

বর্তমান

মোঃ বদিউল আলম
এসিঃ ফোরকিপার, অবনী টেক্সটাইল লিঃ

সময় চলে যায় – –
তিলে তিলে ক্ষয় হয় জীবনের চাকা
নিষ্ঠুর কষাঘাতে কেবলি শুনি ভাঙ্গনের গর্জন।
দুরন্ত যৌবনের বাঁকে বাঁকে দিয়ে যায় বার্ধক্য হাত ছানি
জেগে থাকে ব্যাকুল প্রতিক্ষায় ক্লান্ত দুটি চোখ
দীর্ঘশ্বাসে কেবলি বুক ভারি হয় – –

রাত্রির নির্জনতা বুকে তোলে বিষাদের গর্জন,
এক সময় ভোর হয় – মিথ্যে ভাল থাকার চলে অভিনয়
আবার নেমে আসে ধূসর আঁধার –
তুবও মিছে স্বপ্ন দেখা সোনালী আলোর।

সময় চলে যায় – –
রয়ে যায় জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত,
বিবর্ণ স্বপ্নগুলি বড় অবহেলায় পড়ে থাকে
জীবনের পাতায় পাতায়,
হিসাবের শেষে শুধু পড়ে থাকে সীমাহীন অপূর্ণতা।

সময় চলে যায় – –
অস্থির কষ্টগুলি বাতাসে করে হাহাকার –
মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায় নিষ্ফল অতীত
শুধু রয়ে যায় এক অস্থির বর্তমান –
তুমি, আমি ও আমাদের মাঝে ---

প্রিয় ব্যাবিলন কথকতা

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
অবনী নিটওয়্যার লিঃ

প্রিয় **ব্যাবিলন কথকতা,**

বৈশাখের এই পড়ন্ত বিকেলে এক পশলা বৃষ্টির আগমনে তোমায় ভীষণ মনে পড়ে গেল।

ব্যাবিলন কথকতা! প্রথম পরিচয়েই তোমাকে আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছ। প্রথম সাক্ষাতেই তুমি আমাকে কত কিছুই না শিখিয়েছ। আমরা যারা পোশাক শিল্পে পেশাজীবী তুমি তাদেরকে আত্মবোধনে কি সাহায্যটাই না করেছ। কত দৃঢ়তার সাথেইনা তুমি স্বীকার করেছ আমাদের অবদানের কথা। দেশ ও সমাজ গঠনে আমাদের সু-বিশাল ভূমিকার কথা তোমার মুখে না শুনলে আমি কোন দিনই বোধ হয় তা বুঝতে পারতাম না। তোমার প্রথম আবির্ভাবেই তুমি জানিয়ে দিয়েছ স্পষ্ট ভাষণে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত লাখো লাখো শ্রমজীবীর গৌরবময় কৃতিত্বের কথা। তোমার কথা শুনে আমার মত এই শিল্পের আরো অসংখ্য কর্মীর মন ভরে গিয়েছে নিশ্চয়ই। আমার মত তারাও প্রথম দর্শনে ভালোবেসে বন্ধু করে নিয়েছে তোমাকে।

ব্যাবিলন কথকতা! এর পরেও যে বন্ধু কষ্ট থেকে যায়। তোমার কণ্ঠে এই পেশায় কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর গৌরব গাঁথার বলিষ্ঠ উচ্চারণ যে এখনো অশ্রুত রয়ে গেছে অগনিত মানুষের কাছে। আর তাইতো এখনো সমাজের কাছে আমাদের সঠিক অবস্থান নির্ণীত বা স্বীকৃত হয়নি। পোষাক শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তাদের দিকে এখনো সমাজ বাঁকা চোখে তাকায়। সমাজপতিদের কাছে পোষাক শিল্পের কর্মীরা এখনো যেন অস্পৃষ্য।

জানি, এই অবহেলা বা অধঃমূল্যায়নের কারণও রয়েছে। পোষাক শিল্পের কর্ম পরিবেশ আগের থেকে অনেক ভালো হলেও এই ভালোর ছোঁয়া একশ ভাগ প্রতিষ্ঠানের গায়ে লাগেনি এখনো। একদিকে রয়েছে অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে দেশের শিল্প আইনের প্রায় সব দিকই মানা হয়, মানা হয় নিষ্ঠার সাথে আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের প্রধান প্রধান শর্ত গুলো। যেখানে শ্রমিক কর্মচারীরা পায় তাদের শ্রমের ন্যায্য পারিতোষিক। পায় আন্তরিকতা ও সদাচার কারখানা ব্যবস্থাপনার কাছ থেকে। পায় পর্যাপ্ত আলো বাতাস নিশ্চিত করা নিরাপদ কাজের পরিবেশ। যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা। মায়েদের জন্য রয়েছে শিশু যত্ন কেন্দ্র। যেখানে মা শ্রমিক কর্মচারীরা বিনা খরচে তাদের শিশু সন্তানদেরকে রেখে নিশ্চিন্তে নিয়োজিত থাকতে পারেন স্ব-স্ব-কাজে। অনেক পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে রয়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যেখানে সেলাই প্রশিক্ষণের বাইরেও প্রাথমিক শিক্ষা (অক্ষর জ্ঞান সহ), স্বাস্থ্য সচেতনতা, সামাজিক সচেতনতা সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় সকলকে। এই সব প্রশিক্ষণের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদের তো কোন মূল্য প্রদান করতে হয়ই না, বরং প্রশিক্ষণ কালীন সময় তারাই কোম্পানির কাছ থেকে পূর্ণ ভাতা পান।

ব্যাবিলন কথকতা! দেশের সব পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি এমন হত! তাহলে নিশ্চই আমরা সমাজের চোখে এতটা উপেক্ষিত থাকতাম না। অনেক প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ উল্লেখ করার মত নয়। অনেক প্রতিষ্ঠানে এখনো শ্রম আইন ও আচরণবিধি মানার ব্যাপারে পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সাথে সাথে কারখানা পরিচালন ব্যবস্থাপনা স্তরেও সচেতনতা বাড়ছে। এটা সুলক্ষণ। কিন্তু এই সচেতনতা বৃদ্ধির গতিময়োতা ও সচেতনতা প্রসূত উদ্যোগের মাধ্যমে

ফল লাভের নজির খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয় এখনও। এই অবস্থার আশু অবসান দরকার। আর এখানেই চাই তোমার ভূমিকা **ব্যাবিলন কথকতা**।

ব্যাবিলন কথকতা! দেশের পোষাক শিল্পের সঠিক ভূমিকা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরার জন্য, এই পোষাক শিল্পের ও এর নেপথ্য শিল্পীদের কীর্তির কথা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য তোমার কণ্ঠ যেন কখনো রুদ্ধ না হয়। তোমার বজ্রকণ্ঠে নিঃস্বরিত হোক প্রশংসা গাঁথা সেই সব প্রতিষ্ঠান ও তার কর্মীদের যারা বাংলাদেশে এই শিল্পকে একটি লাভজনক ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তোমার আপোষহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হোক নিন্দাবানী সেই সব কারখানা মালিকদের প্রতি যারা তাদের শ্রমিকদের ন্যূনতম ন্যায্য চাহিদা পূরনে ব্যর্থ হয়েছেন। সেই সব শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে যারা নিজেদের বিবেক বিসর্জন দিয়ে লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানকারী পোষাক শিল্পের বিদায় ঘন্টা বাজাবার মত অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

ব্যাবিলন কথকতা! পরিশেষে সুধাবো-তোমার কণ্ঠ কি নিরব থাকবে ঐ সব বিদেশী তৈরী পোষাক ক্রেতাদের ব্যাপারে, যারা সোচ্চার থাকে পোষাক শিল্পে আচরণ বিধি মেনে না চলা ও নৈতিকতা বহিঃর্ভূত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে? অথচ যারা নিজেরাই নৈতিকতা বহির্ভূত আচরণে দুষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত পোষাক মালিকদের মধ্যে মূল্য কমানোর অনৈতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে নিজেদের মুনাফা রক্ষা ও বৃদ্ধির খেলায় লিপ্ত থাকে ? নিশ্চয়ই না।

ব্যাবিলন কথকতা! তুমি এই শিল্পের বিবেকের কণ্ঠ হয়ে এগিয়ে যাও। দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে তোমার পথ চলা অব্যাহত থাকুক এই সুকামনা ব্যক্ত করে বিদায় নেই আজ।

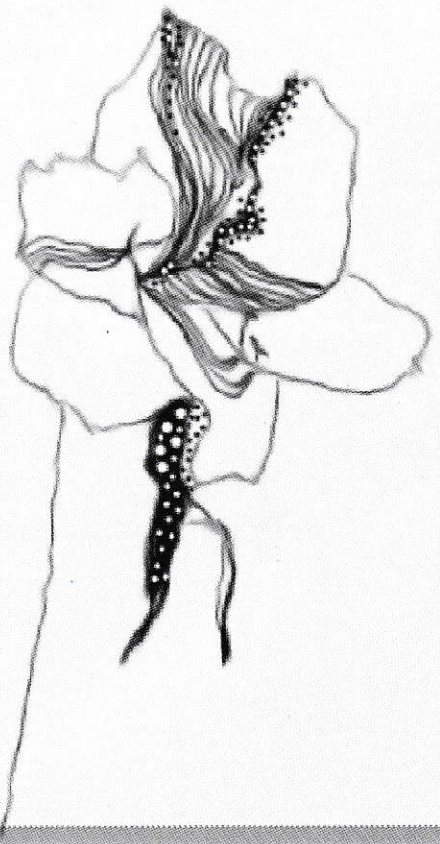

ব্যাবিলনের গান

গীতিকার ও সুরকার ঃ জন সুমিত দেউড়ী

ব্যাবিলন, তোমাকে ভালোবাসি ব্যাবিলন, ব্যাবিলন
তুমি আছো হৃদয়ে সারাদিন সারাক্ষণ ব্যাবিলন।
তুমি আমাদের হৃৎস্পন্দন
ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধন,
আমরা তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি ব্যাবিলন।

আমাদের ব্যাবিলন প্রাণের ব্যাবিলন
তুমি আমাদের ব্যাবিলন।
আমাদের সকলের প্রাণের ব্যাবিলন
তুমি প্রিয় ব্যাবিলন॥

জীবনের সব বাধা পেরিয়ে
আমরা বিজয়ী হবো,
তোমার ছায়ায় আমরা সকলে,
এগিয়ে যাবো।

দুহাত ভরে তুমি দিয়েছো
যা প্রয়োজন,
তোমার বুকেতে আমাদের রাখবে জানি
সারা জীবন॥

আমরা সবাই আছি মিলে মিশে
আছি অনেক ভালো,
আঁধার রাতে আমরা হতে চাই,
দেশেরই আলো।

আজ আমরা গর্বিত হয়েছি
তোমারই জন্য,
আমাদের সব শক্তির উৎস তুমি,
তুমি অনন্য॥

ব্যাবিলন গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

পরিদর্শনরত ক্রেতা

ঘুর্ণিদুর্গতদের সাহায্য প্রদান

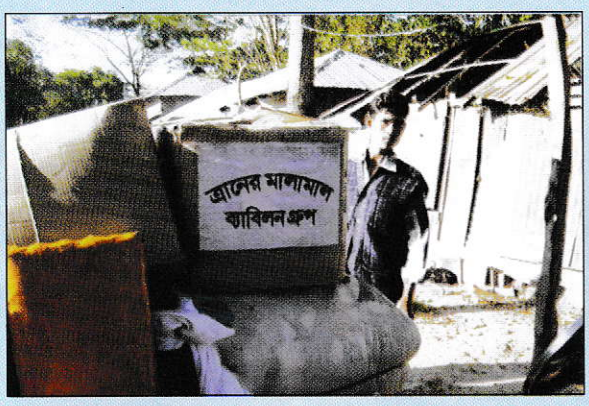

দুর্গতদের পাশে ব্যাবিলন

ফায়ার ট্রেনিং এ কর্মীবৃন্দ

ব্যাবিলন CAD বিভাগ

ডে-কেয়ার সেন্টার

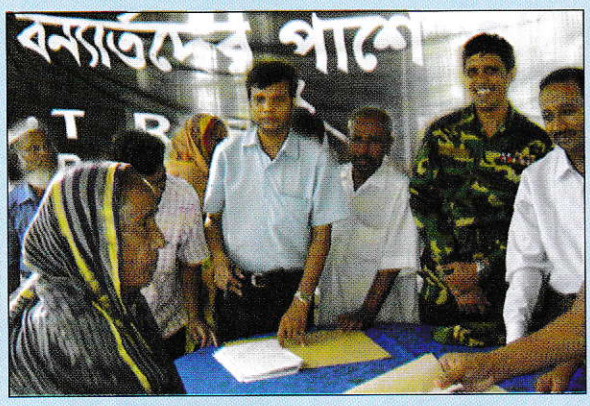

বন্যার্তদের পাশে ব্যাবিলন

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বন্যার্তদের পাশে ব্যাবিলন

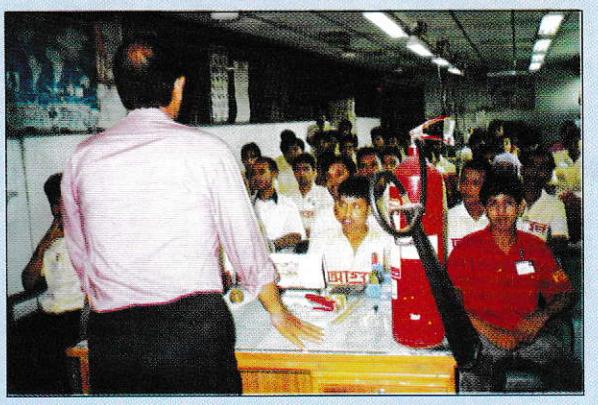

ট্রেনিং সেন্টারে কর্মীবৃন্দ

ট্রেন্ডজ্-এর শার্ট দেখছেন নায়ক ফেরদৌস

নির্মাণাধীন ব্যাবিলন হাসপাতাল

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড
অবনী টেক্সটাইল লিমিটেড
অবনী নীটওয়্যার লিমিটেড
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড
ব্যাবিলন ট্রিম্‌স লিমিটেড
ব্যাবিলন ওয়াশিং লিমিটেড
ব্যাবিলন প্রিন্টস
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড
ট্রেন্ডজ্‌

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ
২-বি/১, দারুস্‌সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
টেলিফোন ঃ ৮০২৩৪৯৫-৬, ৮০২৩৪৬২-৩, ৮০১৩৪৪৯ (অফিস),
৯০০৭১৭৫, ৯০১০৫৩৩, ৮০১১০৮৯ (ফ্যাক্টরী), ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮০১৫১২৮
ই-মেইলঃ: babylon@babylon-bd.com
ওয়েব: www.babylongroup.com